KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication : ৮১ নং বাহির মির্জাপুর
Collection : KLMLGK	Publisher : চারুচন্দ্র ঘোষ
Title : বিভব	Size : 5.5" x 9" 13.97 x 22.86 c.m.
Vol. & Number : ১/১ ১/৫ ১/৮	Year of Publication : আশ্বিন, ১২৭৪ মাঘ, ১২৭৪ ফাল্গুন, ১২৭৪
	Condition : Brittle / Good ✓
Editor : প্রমথনাথ মিত্র	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

একটি করিয়া জীবকুল জাগৃত হইয়া উষার সেই ক্রমোজ্জল বিভার মুখ দেখিয়া প্রীত ও প্রফুল্ল হয়। বঙ্গীয় সাহিত্য-সংসারে এই নবোদিত বিভাও তেমনই বিনা আড়ম্বরে উদিত হইয়া ধীরে ধীরে লোকের মন ও প্রীতি আকর্ষণ করিয়া লইতেছেন। ইহার লেখা সাধারণতঃ সরল, মধুর ও ভাবুকতার পরিচায়ক। প্রবন্ধগুলি প্রায়শই সারগর্ভ ও উপাদেয়। আমরা আশা করি, বিভারশ্মির পর রশ্মিসংযোগে ক্রমশঃও উজ্জলতম অথচ চন্দ্রমার ন্যায় সুখস্পর্শ হইয়া বাঙ্গালীর আদরের সমগ্রীরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবেন।

সারস্বত পত্র। ১৫ মাঘ।

মূল্য প্রাপ্তি।

নাম	ঠিকানা		টাকা
শ্রীযুক্ত আশুতোষচট্টোপাধ্যায়	বেরেলি		২৸০
,, প্রিয়নাথ দাস	পারবালী পোঃ গোপিগঞ্জ		১৲
শ্রীশ্রীদিহিঙ্গ ছত্রাধিপতি বিনন্দচন্দ্র গোস্বামী	নওগাং, আসাম		২৸০
স্বাধীন রাজা সুধল দেব বাহাদুর	রামরা সম্বলপুর		২৸০
রাজা শ্রীবিরেশ্বর রায়	তাহেরপুর		২৸০
শ্রীযুক্তঅক্ষয়কুমারবসু	রালিব্রাদাস অফিস কলিকাতা		২॥০
,, অক্ষয়চন্দ্র ঘোষ	দরজিপাড়া	ঐ	২॥০
,, মন্মথনাথ দে	বাগবাজার	ঐ	২৲
,, পাঁচকড়ি বিশ্বাস	মহেন্দ্র বসুর লেন	ঐ	২॥০
,, অন্নদাপ্রসাদ দে	নবীন সরকার লেন	ঐ	১॥০
,, পূর্ণচন্দ্র রায়	আহিরীটোলা	ঐ	২॥০
,, যোগেন্দ্রনাথ পালিত	তালতলা	ঐ	২॥০
,, কৃষ্ণচন্দ্র বসু	শ্যামবাজার	ঐ	২॥০

কলিকাতা,
১৮ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট নিউ বৃটানিয়া প্রেসে,
শ্রীনগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম. ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

বিভা।

শ্রীচারুচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক

কলিকাতা ৬১ নং বাহির শ্যামবাজার হইতে প্রকাশিত।

বিষয়	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা
অবরোধ প্রথা	শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ শর্ম্মা	২৪১
বসন্তে (কবিতা)	শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র বসু	২৪৯
কলিকাতা নামের উৎপত্তি	শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ দত্ত	২৫১
বাল্য-বিবাহ	শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু	২৬২
বিদায় (কবিতা)	শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র দাস	২৭১
মৃচ্ছকটিক	পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ শাস্ত্রী	২৭২
লক্ষ্ণৌ ও ইহার ভগ্নাবশেষ	শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র গোস্বামী	২৭৫
মুসলমানী বাঙ্গলা	পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম, এ,	২৮২
পুস্তক	শ্রীযুক্ত জানকীনাথ ভট্টাচার্য্য এম, এ,	২৮৬
অনাহুত (কবিতা)	শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী	২৮৮

বিভা সংক্রান্ত কয়েকটি বিশেষ নিয়ম।

১। বিভার বার্ষিক মূল্য কলিকাতার ২৷৷০ টাকা ও মফঃস্বলে ডাকমাশুল সহিত ২৸০ টাকা বার আনা। প্রতি খণ্ডের মূল্য ।৶০ ছয় আনা ও ডাকমাশুল ৵০ আধ আনা।

২। বিভার মফস্বলের গ্রাহকগণকে মূল্য বাবদ স্বতন্ত্র রসিদ দেওয়া যাইবে না বিভাতেই মূল্য-প্রাপ্তিস্বীকার করা যাইবে।

৩। মনি অর্ডার, নোট, নগদ টাকা, ও অর্দ্ধ আনার ডাকের টিকিট ব্যতীত অন্য উপায়ে বিভার মূল্য লওয়া যাইবে না। ডাকের টিকিট পাঠাইলে প্রতি টাকায় /০ এক আনা হিসাবে কমিসন দিতে হইবে। মনিঅর্ডার পাঠাইলে নামের নম্বর কুপনে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে।

৪। গ্রাহকদিগকে বিভার অগ্রিম মূল্য পাঠাইতে হইবে।

৫। কোন গ্রাহক স্থান পরিবর্ত্তন করিলে তাঁহার নূতন ঠিকানা তিনিপত্র দ্বারায় আমাকে যত দিন না জানাইবেন ততদিন পূর্ব্ব ঠিকানাতেই তাঁহার পত্রিকা পাঠান যাইবে ইহাতে পত্রিকা পাওয়া সম্বন্ধে কোন গোলযোগ হইলে তজ্জন্য আমরা দায়ী হইব না।

৬। বিভার সমস্ত পত্র, প্রবন্ধ, পুস্তক ও মূল্যাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় আমার নামে পাঠান আবশ্যক। ব্যারিং বা ইন্‌সফিসেণ্ট পত্র গৃহীত হইবে না। কেহ কোন প্রবন্ধ বিভার আফিস হইতে ফেরত লইতে অথবা পত্রের প্রত্যুত্তর পাওয়ার ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে ডাকমাশুল পাঠাইতে হইবে।

৭। বিভা প্রতিমাসে নিয়মিত প্রকাশিত হইবে। কোন গ্রাহক পত্রিকা না পাইলে তাহার পর মাসের ১ম সপ্তাহের মধ্যে আমাকে না জানাইলে তজ্জন্য আমরা দায়ী হইব না।

৮। মফঃস্বলের গ্রাহক মহাশয়গণ পত্র লিখিবার সময় অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাদিগের আপন আপন নামের নম্বর উল্লেখ করিবেন নতুবা তাঁহাদিগের চিঠির উত্তর দেওয়া বড় সহজ হইবে না। টাকা পাঠাইবার সময় ও ঐরূপ নম্বর উল্লেখ করা আবশ্যক। পত্রিকার মোড়কের উপর আপন আপন নামের নম্বর দেখিতে পাইবেন।

বিভায় বিজ্ঞাপন দিলে প্রত্যেক লাইনে ।০ চারি আনা দিতে হইবে। অধিক দিনের জন্য হইলে সতন্ত্র বন্দোবস্ত করা যাইবে।

৬১নংবাহির শ্যামবাজার
কলিকাতা।

শ্রীপ্রমথনাথ মিত্র।
বিভার কার্য্যাধ্যক্ষ।

বিভা।

[৬ষ্ঠ সংখ্যা সন ১২৯৪ সাল ১ম খণ্ড]

অবরোধ প্রথা।

শিক্ষিত ব্রাহ্ম।—আমি অবরোধ প্রথা সম্বন্ধে আপনাকে দুই একটা কথা বলিতে ইচ্ছা করি। আমার প্রথম জিজ্ঞাস্য—এ কুপ্রথা আমাদের দেশে ইদানীন্তন উদ্ভূত হইয়াছে, না প্রথম হইতে চলিয়া আসিতেছে। এ সম্বন্ধে আপনাদের পুরাণ্ রামায়ণ মহাভারতে কি দেখিতে পান?

শিক্ষিত হিন্দু।—আজকাল ইউরোপে যতটা স্ত্রীস্বাধীনতা দেখিতে পাওয়া যায়, পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষে ততটা ছিল কি না, আমি নিশ্চয় কিছু বলিতে পারি না। ভাব গতিক দেখিয়া বোধ হয়, অপেক্ষাকৃত কম মাত্রায় ছিল। কিন্তু শুধু রামায়ণ মহাভারত কেন আমাদের সেকেলে পুঁথি মাত্রেই ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়, যে তখন স্ত্রী স্বাধীনতার বিশেষ অভাব ছিল না।

ব্রা। তবে কোন্ সময়ে এবং কি কি কারণে এ প্রথার প্রথম উৎপত্তি?

হি। মুসলমান শাসনের সময়ে যে ইহা প্রথম দেখা দিয়াছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। যে সময়ে তাহারা প্রথম ভারতবর্ষ আক্রমণ করে, অবরোধ প্রথার গোড়াপত্তন সেই সময়ে। মুসলমানদের জারিজুরির সময়ে স্ত্রীলোকদের সাবধানে রাখিবার জন্য আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা এই প্রথার সৃষ্টি করেন। মুসলমানদের মধ্যে পূর্ব্ব হইতেই পর্দ্দার প্রচলন ছিল; অতএব ইহাও বড় অসম্ভব নহে যে তাহাদের দেখাদেখি আমরা তাহাদের ব্যবহার অনুকরণ করিয়াছি। আমার বোধ হয় এই দুই কারণের যোগে এই ব্যাপারটা ঘটিয়াছে। যে সকল দেশে মুসলমানেরা ভাল রূপ দখল করে নাই, সে সকল দেশে আজিও দেখিতে পাওয়া যায়, স্ত্রীলোকদের সম্বন্ধে অতটা আদব কায়দা নাই।

ব্রা। মুসলমানদের শাসন কালে অশেষ

প্রকার উপদ্রব ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই কারণে স্ত্রীলোকদের আড়ালে রাখিবার খানিকটা প্রয়োজন ছিল তাহাও আমি স্বীকার করি। প্রবল ও নিষ্ঠুর মুসলমানদের হস্তে হিন্দুদের ন্যায় দুর্ব্বল জাতির এরূপ ভিন্ন আর কি উপায় আছে? এখনত মুসলমানের রাজত্ব নাই, এখন ত কোন রূপ দৌরাত্মের সম্ভাবনা নাই, এখন তবে আপনারা এ প্রকার একটা কুপদ্ধতিকে সমাজে স্থান দিতেছেন কেন? উহা একেবারে উঠাইয়া দেওয়াইত সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

হি। আপনি যাহাকে কর্ত্তব্য মনে করেন, তাহা বাস্তবিক কর্ত্তব্য হইতেও পারে, না ও হইতে পারে। দেশশুদ্ধ লোকে অবরোধ প্রথা উঠাইয়া দেওয়া উচিত মনে করে না, সেই জন্য আজিও উহার প্রাদুর্ভাব। আসল কথা একটা পুরাতন নিয়ম সমাজ হইতে উঠাইয়া দেওয়া কিম্বা একটা নুতন নিয়ম সমাজে স্থাপন করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। আপনারা বোধ হয় এ কথার যথেষ্ট সার্থকতা দেখিতে পাইতেছেন। আমাদের সমাজে আর কিছু থাক আর না থাক্, একটা ভাল জিনিস্ আছে। লোকে সমাজে একটা বাঁধুনি (ভালই হউক আর মন্দই হউক) হঠাৎ ছিঁড়িয়া ফেলিতে চাহে না। আজ এক রকম, কাল আর এক রকম—আমাদের কদাচ এরূপ পদ্ধতি নহে। আমি ইহাকে একটা বিশেষ সুলক্ষণ বলিয়া মনে করি। এ ঝোঁকটা আমাদের দেশে কিছু বাড়াবাড়ির দিকে যায়—এই টুকুই দুঃখের বিষয়। আসলে জিনিসটা ভাল। আর একটা কথা। মুসলমান রাজত্ব গিয়াছে সত্য, কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে কি রামরাজ্য উপস্থিত হইয়াছে? আমরা এখনও পরের হাতে আছি—একথা সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত। আমাদের কর্ত্তারা ধার্ম্মিক ন্যায়পরায়ণ, একথা স্বীকার করি। কিন্তু তাঁহাদের ধর্ম্মপথে, ন্যায় পথে রাখিতে পারি, আমাদের কি এতটা ক্ষমতা জন্মিয়াছে? আমরা তাহাদের হাতে, না তাহারা আমাদের হাতে? আমরা যতটুকু নড়িয়া চড়িয়া বেড়াইতে পাই, সবই তাঁহাদের কল্যাণে—নিজের জোরে কি? এইত সভ্য ইঙ্গরেজ রাজত্ব,—কত উন্নতি, কত আইন, কত পুলিশ কত কি,—আজিও দিনের বেলায় বাঙ্গালী ভায়াদের মাঠে, ঘাটে, রেলে, জাহাজে সর্ব্বত্রই কত লাথি ঘুসি খাইয়া চুপ করিয়া থাকিতে হয়। আমার মতে স্ত্রীলোকেরা ত আছে ভাল; আর বরং একটা নিয়ম করা উচিত, যে পিলেরোগী বা ক্ষীণজীবী বাঙ্গালি পুরুষরাও যেন পর্দ্দার ভিতরে থাকেন—ভুলিয়াও যেন সাহেবেরা তাহাদের মুখ দেখিতে না পায়। আজ যেন আমি স্বচ্ছন্দে আমার স্ত্রীর হাত ধরিয়া সন্ধ্যার সময় একবার ইডেন গার্ডেনে পদ-সঞ্চারণ করিয়া আসিলাম। কাল যেন—কৃসমস ইভের দিন—গ্রেটইষ্টারনে ভীড় ঠেলিয়া ভগিনীগণকে লইয়া কেক কিনিতে যাইলাম। চিরকাল কি আমার এইরূপ চলিবে? এই কি আমাদের চিরস্থায়ী কায়েমী অবস্থা? কাল যদি এখানে চীনের রাজত্ব হয় কিম্বা ইংরাজরাই যদি হঠাৎ বিগড়াইয়া দাঁড়ায় ও মুসলমানদের মত উৎপাৎ আরম্ভ করে, তাহা হইলে পরশু কি আমাদের সপরিবারে

ব্যারাকপুর পার্কে পিক্‌নিক্ করিতে যাওয়া পোষাইবে? আমরা ইংরেজ রাজত্বে কেমন একটা সুখের স্বপ্নে ভোর হইয়া আছি। যেন আমাদেরই রাজত্ব, ইঙ্গরেজেরা আমাদের আপনার, ও আমাদের হইয়া রাজত্ব চালাইতেছে। পরশাসনে এত মুগ্ধ পৃথিবীতে আর কুত্রাপি কোন জাতিকে দেখা যায় নাই। জাতীয় নীচত্বের পরিচয়, ইহার অপেক্ষা আর কি অধিক হইতে পারে? এ জাতির কি কখন উন্নতি আছে? ফরাসীরা যখন বলপূর্ব্বক ইতালী অধিকার করে, তখন শত শত ইতালীয় পরিবার অবনতমস্তকে স্বদেশ ত্যাগ করিয়া দেশদেশান্তরে চলিয়া যায়। গারিবল্ডীর বাহুবলে যখন ইতালী পুনরায় স্বাধীনতা প্রাপ্ত হয়, তখন তাহারা প্রফুল্ল বদনে প্রবাস হইতে স্বদেশে ফিরিয়া আইসে—ইহারাই প্রকৃত মানুষ। এদিকে আমরা ইংরাজ শাসনে কেবল আমোদ প্রমোদ ভোগবিলাস ছাড়া আর কিছু জানি না। খবরের কাগজে ইংরাজদের দুটা গালি দিয়া আমাদের ফুরাইয়া যায়। রাজপুত রমণীরা পাছে মুসলমানদের স্পর্শে কলুষিত হয়, এই আশঙ্কায় জলন্ত অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিয়াছিল। আজিও সে ভাব সম্পূর্ণ লুপ্ত হয় নাই! আমাদের বাঙ্গালায় পূর্ব্বে কি ছিল জানি না, আজকাল দেখিতে পাই যদি একজন লেডি গ্রাজুয়েটের পিট চাপ্‌ড়াইয়া ভাইস্ চ্যান্সেলার সাহেব বলেন—"you have my best congratulations, Mrs. so and so," তাহা হইলে তিনি যেন হাতে স্বর্গ পান।

একটা জাতীয় নিয়ম হঠাৎ বদলাইয়া ফেলা কিছু বুদ্ধির কাজ নহে। প্রথমে দেখা উচিত, বর্ত্তমান প্রথাটা কতদূর দূষণীয়। দোষটা কি এতই ভয়ানক যে আজই তাহার একটা প্রতিকার না করিলেই নহে?—ইহাও একটা মীমাংসনীয় বিষয়। আর এই একটা মস্ত কথা, যে পরিবর্ত্তন কায ভাবিয়া চিন্তিয়া বুঝিয়া সুঝিয়া করাই ভাল, তাড়াতাড়ির কিছু নহে।

ব্রা। আপনি অনেক কথা বলিয়া ফেলিলেন, আমি তাহার মাথা মুণ্ড কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। আপনি কি বলিতে চাহেন যে আমাদের জাতীয় অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই? আলাউদ্দিনের সময়ে যেখানে ছিলাম আজিও সেই খানে আছি? উৎকৃষ্ট শাসন প্রণালীতে বিদ্যাশিক্ষার প্রভাবে এদেশের কি কিছুই পরিবর্ত্তন হয় নাই, কিছুই উন্নতি হয় নাই? যদি হইয়া থাকে (এ কথা কে অস্বীকার করিবে?) তবে এই উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সমাজ উন্নতির চেষ্টা করা কি উচিত নহে? অবরোধ প্রথা উঠাইয়া দিবার কি আজিও সময় হয় নাই? অবশ্যই হইয়াছে। ভবিষ্যতে কি হইবে, না হইবে সে কথায় আমাদের প্রয়োজন কি? যাহা ভাল তাহা আজিই করা উচিত। আপনি বলিয়াছেন একটা কিছু পরিবর্ত্তন করিবার পূর্ব্বে সে কার্য্যের প্রয়োজনীয়তা দেখা উচিত। ঠিক্ কথা। দেখুন বাঙ্গালী স্ত্রীর অবস্থা পিঞ্জরাবদ্ধ পাখীর অপেক্ষাও শোচনীয়। তাহারা যেন কেবল সংসারের যত নিকৃষ্ট কায করিতে জন্মিয়াছে। দুদণ্ডের তরে তাহাদের জীবনে সুখ নাই। তাহারা

পৃথিবীর কিছুই দেখিতে পায় না। রন্ধনশালা হইতে খিড়্‌কির দরজা পর্য্যন্ত তাহাদের দুনিয়ার সীমানা।

ইহার বাহিরে সমস্ত পৃথিবী তাহাদের পক্ষে মধ্য আফ্রিকার অনাবিষ্কৃত অরণ্য। অহোরাত্র ঘোরতর পরিশ্রম করিয়া পরিবারস্থ সকলের মন যোগাইয়া চলিতে হয়, ইহাতেও পরিত্রাণ নাই। সংসারের সমস্ত ঝুঁকি তাহাদের উপর। পুরুষদের নিকট কোন রকম সাহায্য পাওয়া ত দূরের কথা, বাবুরা বাড়ী ফিরিয়া সময়ে অসময়ে আহারাদি প্রস্তুত না পাইলে তাহাদের রাগের আর সীমা থাকে না। সে দিন আর বাড়ীর মেয়েদের রক্ষা নাই। এইরূপ কদাকার পদ্ধতিকে সমূলে ধ্বংশ করা উচিত নচেৎ সময়ে উহাই সমাজকে ধ্বংস করিবে সন্দেহ নাই। গৃহমধ্যে বদ্ধ থাকাতে স্ত্রীলোকদের মন কি প্রকার সঙ্কীর্ণ হইয়া যায় একবার ভাবিয়া দেখুন। ইহাতে সন্তান সন্ততির সুশিক্ষার পক্ষে কতদূর ব্যাঘাত ঘটে তাহাও একবার ঠাওরাইয়া দেখুন। এ প্রকার একটা কু প্রথাকে আপনি কি বলিয়া পোষকতা করিতেছেন?

হি। প্রথাটা "কু" বলিতে পারেন কিন্তু আপনি যতটা "কু" মনে করিতেছেন, ততটা নহে। আপনিত বলিলেন, স্ত্রীলোকদের অবস্থা পিঞ্জরাবদ্ধ পাখী অপেক্ষাও শোচনীয়—অনেকে মনে করিয়া থাকেন যে তাহারা জেলখানার কয়েদীদের অপেক্ষা কষ্ট ভোগ করে। ইহা সমস্তই বাড়ান কথা। গৃহকর্ম্ম বিষয়েত সকল হিন্দুর ঘরেই স্ত্রীলোকেরা সর্ব্বেসর্ব্বা। এ কথা যিনি না মানেন, তিনি কিছুই জানেন না। বাড়ীর গৃহিণী এক প্রকার Secretary of State for Home Affairs, এ ছাড়া যে সকল কুলরমণীরা অল্পবিস্তর লেখা পড়া জানেন (হিন্দুর ঘরে অনেক বুদ্ধিমতী স্ত্রী আছেন, যাঁহারা একজামিন্‌ও দেন নাই এবং পাশও করেন নাই আর নাম দিয়া সংবাদ পত্রে আর্টিকেলও লিখেন না) তাঁহাদের কথাত সত্য, তাঁহারাও প্রকৃতপক্ষে স্বামীর সহধর্ম্মিণী। উন্নত ইউরোপীয় সমাজে যাহাকে সহধর্ম্মিণী বলে, তাঁহারাও সেই হিসাবে স্বামীর সহধর্ম্মিণী, শুধু এইটুকু তফাৎ, যে তাঁহারা নিতান্ত খোলা হিসাবে বেড়াইতে পান না, অপরিচিত পুরুষের সম্মুখে বাহির হন্ না, বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় দিবার অবকাশ পান না। আর বাড়ার ভাগ দেখিতে পাই যে হিন্দু কুলরমণীদের একটা অতি সুন্দর কোমল লজ্জার ভাব আছে, যাহা আর কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সাধারণতঃ হিন্দুর স্ত্রীরা ঘরকন্নার কাজ করিয়া, পরিবারস্থ সকলের আহার পরিধানের ব্যবস্থা করিয়া, সন্ধ্যা আহ্নিক করিয়া, পাড়ার বৌঝির সহিত দুটা গল্পগুজব করিয়া, তাস খেলিয়া বা একটু আদটু রামায়ণ মহাভারত পড়িয়া মনের সুখে কাল কাটায়। আপনারা তাহাদের দুর্দ্দশার কথা শুনিয়া কাঁদিতেছেন, তাহারা আপনাদের কান্না শুনিতেও পায় না। শুনিলেও তাহার মর্ম্ম বুঝে না; দিব্য হাসিয়া খেলিয়া সংসার চালাইতেছে। অনেকে যে হিন্দুরমণীর দুরবস্থার কথা অত্যন্ত বাড়াইয়া, রংচং দিয়া বলিয়া থাকেন, Colonel Todd সাহেব তাহা স্পষ্ট বুঝিয়া ছিলেন, তিনি তাঁহার Rajasthan

গ্রন্থে বলেন—

"The superficial observer who applies his own standard to the customs of all nations, laments with an affected philanthrophy the degraded condition of the Hindu female, in which sentiment he would find her little disposed to join. He particularly laments her want of liberty and calls her seclusion imprisonment" হিন্দু রমণীরা একেবারে জেলখানার কয়েদী একথা আমরা শুনিতে চাহি না। আমরা জানি, তাহাদের অল্পবিস্তর স্বাধীনতা না আছে এমত নহে। তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারেন যে সেই স্বাধীনতার সীমা কতকটা বাড়ান উচিত। বুঝিয়া সুঝিয়া ধীরে ধীরে এ কার্য্যে অগ্রসর হইলেই, উহা সুসিদ্ধ হইতে পারে। আপনি যে মনের সঙ্কীর্ণতার কথা বলিয়াছেন, তাহার একমাত্র ঔষধ সুশিক্ষা। স্ত্রীলোকদিগকে বাড়ীর বাহিরে আনিলেই যে বিশেষ উপকার হইবে এমত নহে। সুশিক্ষা আবশ্যক। আমারা কেহ স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী নহি। অন্দরমহল বজায় রাখিয়া স্ত্রীলোকদিগকে সুশিক্ষিত করা দুঃসাধ্য নহে। আমরা বলি এখনকার পক্ষে ইহাই সদুপায়।

ব্রা। হিন্দু রমণীদের অবস্থা কি নিতান্ত শোচনীয় নহে? আপনি দেখিয়া শুনিয়া কিরূপে এমন কথা বলিলেন? হিন্দু রমণীদের আর্ত্তনাদ শুনিয়া আমাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে, আর আপনি বলিতেছেন যে তাহাদের কোন কষ্টই নাই, তাহারা মনের সুখে আছে? সে যাহা হউক আপনাকে একটা মোটামুটি কথা বলি। সকল বিষয়ের ভাল মন্দ গুণ, তাহার ফলাফল দেখিয়া নির্ণয় করিতে হয়। ইউরোপে দেখুন স্ত্রীস্বাধীনতা থাকিয়া কতদূর উন্নতি হইয়াছে, আর এদেশে তাহা না থাকাতে আমাদের কতদূর দুর্গতি হইয়াছে। ইহা অপেক্ষা আর কি প্রমাণ থাকিতে পারে?

হি। ইউরোপে যে প্রকার উন্নতি হইয়াছে, আমাদের দেশে কোন কালে সে রকম উন্নতির চেষ্টা ছিল না এবং তাহার জন্য যোগাড় ও হয় নাই। আপনি যদি রেলগাড়ি, জাহাজ, কামান, বন্দুক, দেখিয়া জাতির উন্নতি স্থির করিতে চাহেন, তাহা হইলে জানিব যে আপনি হিন্দু জাতির সভ্যতার লক্ষ্য কিছুই বুঝিতে পারেন নাই। পাশ্চাত্য সভ্যতা ও হিন্দু সভ্যতার গতি সম্পূর্ণ বিপরীত। ঐহিক সুখসচ্ছন্দতাবৃদ্ধি ইউরোপীয় সভ্যতার মূল মন্ত্র। হিন্দুদের এই পৃথিবীর উপরে আদৌ নজরই ছিল না। তাঁহাদের উদ্দেশ্য—ধর্ম্মজ্ঞান, বৈরাগ্যতা। তাঁহাদের সকল কাজে তাঁহারা এই একমাত্র লক্ষ্য রাখিয়া চলিতেন। এখন অবশ্য আমাদের অবস্থার অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। এখন কাজেকাজেই ইউরোপীয় সভ্যতার পথ আমাদের অনুসরণ করিতে হইতেছে। এখন আর কেহ মোক্ষ, নির্ব্বাণ লইয়া পাগল নহে। কাল যদি সমগ্র বাঙ্গালাদেশ হঠাৎ ইংলণ্ড বা ফ্রান্স হইয়া উঠে—সকলেই হ্যাটকোটধারী, মটনভোজী,—জাতিভেদ নাই,—বাঙ্গালি বিবিরা গাড়ি করিয়া হগ সাহেবের

বাজারে মুরগি কিনিতে যাইতেছে, গবর্ণমেণ্ট হাউসে বাঙ্গালীর Congress (গমুজের উপর "স্বাধীনতা সাম্য মৈত্রি" খচিত নিশান) বাঙ্গালীর Army, বাঙ্গালীর Navy, বাঙ্গালীর Commerce চারিদিকে বিরাজমান্—তাহা হইলেকি আনন্দ!—এখন ইহা অপেক্ষা সুখের অবস্থা কল্পনা করিতে পারি না। সে কালের মোক্ষ,আর একালের এই। কোন্ উদ্দেশ্যটা বড় আপনি স্থির করুন।

আমার বক্তব্য, যখন আমরা আমাদের পুরাতন জাতীয়ভাব সমস্ত ভুলিয়া গিয়া সকল বিষয়ে ইউরোপীয় হিসাবে উন্নতি লাভ করিব, তখন না হয় পাশ্চাত্য আচার ব্যবহার অনুকরণ করা যাইবে। আর একটা কথা। ইউরোপীয়দের স্ত্রীস্বাধীনতা ছিল বলিয়াই যে তাহারা এত উন্নতি করিয়াছে, আর আমাদের তাহা নাই বলিয়াই যে আমাদের দুর্দ্দশা হইয়াছে, এমন মনে করিবেন না। দুদিকেই অনেক কারণ আছে।

অবরোধ প্রথা যদি উঠাইয়া দেওয়াই উচিত হয়, তাহা হইলে কাজটা অতি সাবধানে অতি ধীরে সম্পন্ন করিলেই ভাল হয়। হঠাৎ একটা কিছু করা বড় বিপদজনক। হরি বাবুর মাতাঠাকুরাণী কোন কালে নিজ বাড়ীর বৈঠকখানায় পদার্পণ করেন নাই, আর আজ তাঁহার কন্যারত্ন মিস্ যাদুমণি ঘোষ অন্দর মহল Abolish করিয়া তাঁহার Dear betrothed রামু সাহেব বারিষ্টারের সহিত ষ্টাণ্ডে হাওয়া খাইতে যাইতেছেন, গঙ্গারধারের বাগানবাড়ীতে যাইয়া, তাঁহার সহিত নৌকার দাঁড় টানিতেছেন, সামুবাবুর (Evning) পার্টিতে দুটা গান গাইয়া আসিতেছেন, ইহা যে শুধু দেখিতে ভয়ানক, তাহা নহে, ইহার ফল ও অতি বিষময়। একটা শিকলে বাঁধা কুকুর হঠাৎ যদিএকবার ছাড়া পায়, তাহা হইলে কি তাহার লাফালাফির সীমাপরিসীমা থাকে? স্থানে স্থানে ঠিক্ এই প্রকার ঘটিয়াছে। বিলাতি চাল, নকল করিতে গিয়া অনেকে আসলকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ত সে দিন কার জিনিস? ইহার মধ্যেই সেখানে সম্পূর্ণ স্ত্রীস্বাধীনতার কি ফল ফলিতেছে দেখুন। "নব্য ভারত" ঐ সমাজের মুখ পত্র, এ সম্বন্ধে উচ্চৈঃস্বরে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে যে,—"এইরূপে দিন দিন নানা প্রকার কদর্য্য আচার ব্যবহার এই পবিত্র ধর্ম্মসমাজ মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। বিলাতি চাল চলন কি এক ভয়ানক আধিপত্য বিস্তার করিতেছে। চতুর্দ্দিক হইতে গালিগালাজ বর্ষিত হইতেছে, তবুও চেতনা নাই * * লোকে দেখিয়া শুনিয়া শিক্ষা পায় লোকে বলে। কিন্তু এ সমাজের লোকেরা দেখিয়া ঠেকিয়া তবু এ সম্বন্ধে নিতান্ত উদাসীন।"* এ প্রকার ফল যে ফলিবে তাহাতে আর বিচিত্র কি? হঠাৎ একটা সামাজিক নিয়মের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন করিয়া কবে কোথায় ভাল হইয়াছে। কবি ঈশ্বর গুপ্ত ৩০ বৎসর পূর্ব্বে যাহা কল্পনা করিয়াছিলেন, আজি আমরা তাহা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি।—

"এরা গাউন প'রে টাউন মাঝে, বিলাতি মেম হবেই হবে।

* গত ফাল্গুন মাসের নব্য ভারতে দৌন বিবাহ ও ব্রাহ্ম সমাজ শীর্ষক প্রবন্ধ দেখুন।

এরা এ'বি প'ড়ে বিবি সেজে, বিলাতি বোল কবেই কবে॥
আর কি এরা আদর করে, পিঁড়ি পেড়ে অন্ন দেবে।
আর কি এরা এমনি করে, সাঁজ সেঁজুতির ব্রত নেবে॥
আর কিছু দিন থাক্‌লে বেঁচে, সবাই দেখ্‌তে পাবেই পাবে।
এরা আপন হাতে হাঁকিয়ে বগি, গড়ের মাঠে হাওয়া খাবে॥"

ভ্রা। আপনার কথার ত আমি কোন মানেই দেখি না। আপনি বলেন যখন আমরা ইউরোপীয়দের মত উন্নতি লাভ করিব, তখন তাহাদিগের আচার ব্যবহার অনুকরণ করা যাইবে। ইহা যে আপনার ভয়ানক একটা উল্‌টা কথা। গাছে ফুল হইবার পূর্ব্বে কি করিয়া ফল হইতে পারে? উন্নতির উপায় অবলম্বন না করিলে কি করিয়া উন্নতি সিদ্ধ হইতে পারে? স্ত্রীলোকদের দাসত্বশৃঙ্খল উন্মোচন উন্নতির একটি প্রধান উপায়। অতএব যদি উন্নতি চাহেন তবে এই মহৎ কার্য্যটি অগ্রে করা উচিত। এবিষয়ে আর কি কোন সন্দেহ আছে?

আপনি আমাদিগের সমাজের সম্বন্ধে দুএকটি কথা বলিয়াছেন, আমি স্বীকার করি যে আমাদিগের সমাজে দুএকটা কুপদ্ধতি প্রবেশ করিয়াছে। অনেকখানি গুণের সঙ্গে যদি অল্প দোষ থাকিয়া যায়, তাহাতে বিশেষ আপত্তি কি? উহাত এক প্রকার অনিবার্য্য বলিলেই হয়। পৃথিবীতে এমন কোন্ লোক-সমাজ আছে, যাহা একেবারে ষোল আনা খাঁটী? "নব্য ভারতের" লেখক যাহা বলিয়াছেন, তাহা কোন কাজের কথাই নহে, আমি তাহা বিশ্বাস করি না। আপনারা স্ত্রীজাতিকে কি এতই অপদার্থ মনে করেন যে তাঁহাদের চাবি তালার ভিতর রাখা ভিন্ন আর কোন উপায় নাই। স্ত্রীজাতীকে কি আপনারা এতদূর অপমান করিতে প্রস্তুত? আপনারা তবে জোর করিয়া তাহাদিগকে সৎপথে রাখিতে প্রয়াস পান? ইহাও কি একটা বড় গৌরবের কথা না কি? মহাকবি মিল্‌টন্ "Cloistered virtue সম্বন্ধে কি রকম তেজের সহিত লিখিয়াছেন, আপনি কি তাহা জানেন না? Cloistered virtue কে কি আদরে virtue বলা যায়? আমি বলি সে রকম virtue থাকায় না থাকায় সমান।

হি। মিল্‌টন্ সাহেব যাহাই বলুন না কেন আমাদের মোটা বুদ্ধিতে এইটুকু বুঝি যে আমাদিগের স্ত্রী কন্যারা পর্দ্দার ভিতরে থেকে আছে ভাল। Cloistered virtue কে virtue বলুন আর নাই বলুন, একথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে স্ত্রীচরিত্র আমাদের দেশে যে রকম পবিত্র, ইউরোপে কোন কালে সে রকম ছিল না, আর হবেও না। এইজন্য পারিবারিক সুখসচ্ছন্দতা আমাদের দেশে যতটা আছে, ইউরোপে তার বারো আনা ভাগও নাই। এ হিসাবে হিন্দু সভ্যতা পাশ্চাত্য সভ্যতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আপনারা ইউরোপের অনুকরণ করিতে গিয়া যে ভাল করেন নাই, আমারা তাহা স্পষ্ট দেখিতেছি। দেখুন আর নাই দেখুন, স্ত্রীপুরুষের বেশি রকম মেশামিশিটা বড় ভাল জিনিস নহে;

আমাদের চক্ষে উহা অতি জঘন্য ঠেকে। আপনাদের সমাজের ভালটা আপনি যত বড় দেখিতেছেন, বাস্তবিক তাহা তত বড় কিনা জানি না।—হইলেও হইতে পারে। কিন্তু মন্দটা আপনার চক্ষে আপনি যত ছোট দেখিতেছেন, তাহার অপেক্ষা দশ গুণ বড়।

সে যাহা হউক এ বিষয়ের আপনার সঙ্গে তর্ক করিয়া ফল নাই। এ রকম বিষয়ের ভাল মন্দ নিক্তিতে ওজন করিয়া দেখান যায় না, অতএব আপনাদের মত লোকদের বুঝাইয়া উঠা মুসকিল্।

আপনাকে আর একটি কথা বলি। সমাজের ভয় সর্ব্বত্রেই মানুষকে ধর্ম্মপথে রাখে, ইহাত স্বীকার করেন? ইউরোপীয় philosopher মাত্রেই সমাজভয়কে একটা প্রধান Moral restraint বলিয়া গণ্য করেন। এ জিনিষটা কি একেবারে উঠাইয়া দেওয়া বুদ্ধির কাজ? কিন্তু আপনারাত তাহাই করিতেছেন। আপনাদের ভাব গতিক চালচলন দেখিয়া আমাদের যেমে সকলেই আশ্চর্য্য হয়। সকলেই বিরক্ত হয়, সকলেই রাগ প্রকাশ করে। "বঙ্গবাসী" কাগজ ও বিবাহ-বিভ্রাট নাটক ইহার প্রমাণ। আপনাদের সুশিক্ষিত কন্যারা যে রকম বিবিয়ানা আরম্ভ করিয়াছেন, আমরা তাহা দেখিয়া সত্যসত্যই লজ্জিত হই। আপনারা খুবই জানেন যে আপনাদের রীতিনীতি দেশের লোকের পছন্দসই নহে; জানিয়াও আপনারা গ্রাহ্য করেন না। সমাজভয়টা আপনারা সমূলে উপড়াইয়া ফেলিয়াছেন।

ব্রা। আপনি কি বলেন যে, সকল বিষয়েই সাধারণ লোকের মত লইয়া কাজ করিতে হইবে? তাহা হইলে সমাজের সকল সদনুষ্ঠানই সাধনাতীত হইয়া দাঁড়ায়। তাহা হইলে সমাজের যত কুসংস্কার, যত কুপদ্ধতি, সকলই বজায় রাখিতে হয়।

হি। সকল কাজেই সাধারণ লোকের মতামত লইয়া চলিতে হইবে এমত নহে, তবে সেই মত অনুসারে চলাই নিয়ম করা উচিত। নিয়মের দুই একটা ব্যতিক্রম হইলেও হইতে পারে। অবরোধ প্রথার মত একটা বিষয়ে সকল লোকের অভিপ্রায় জানা এবং সেই অনুসারে কাজ করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। সমাজভয় বলিয়া একটা জিনিষ দেশে থাকিলেই ভাল হয়। উহা উঠিয়া গেলে উহার পরিবর্ত্তে নিশ্চয় যথেচ্ছাচার আসিয়া উপস্থিত হইবে। আপনি একজন ভাল লোক, যাহা করিবেন তাহা পবিত্র ভাবে করিবেন। আপনি সমাজনীতি বিপরীত একটা কোন কাজ করিলেও সমাজের কোন অনিষ্ট না হইতে পারে। কিন্তু একজন কুপ্রবৃত্তির লোক কোনমন্দ কাজ করিতে গেলে কি বাধা বা প্রতিবন্ধক পাইবে? সে ত যাহাই ইচ্ছা, তাহা করিতে পারে। এ জগতে এইরকম লোকেরই প্রাদুর্ভাব। আর ইহাও মনে রাখা কর্ত্তব্য যে, পবিত্রতার ভেকে লোকে যত কুকাজ করিয়া থাকে, তত আর কিছুতেই নহে।

সমাজ ভয় বজায় রাখিয়া কি দেশের কোন উন্নতি সাধন করা অসম্ভব? আমার মতে তাহা অসম্ভব নহে। আপনারা যেরূপ উপায়ে সমাজ-সংস্কার করিতে বসিয়াছেন, তাহা আদৌ সদুপায় নহে। একটা কুপ্রথা সমাজ হইতে উঠাইয়া দিতে গেলে, তাহার প্রকৃত উপায় এই। প্রথাটা যে দুষণীয়, সকলে যাহাতে স্পষ্ট বুঝিতে পারে, সংস্কারকের প্রথমতঃ এই একমাত্র চেষ্টা থাকা উচিত। সকলকে বুঝান উচিত যে প্রথাটা উঠাইয়া দিলেই সমাজের মঙ্গল হইবে। একবার সাধারণ লোকের মনে এ প্রকার বিশ্বাস জন্মিলে প্রথাটা আপনা আপনিই লোপ পাইবে, আর অধিক কাট খড়ের প্রয়োজন হইবে না। এ সম্বন্ধে সুপ্রসিদ্ধ Sir Arthur Helps ঠিক এই কথা বলেন। তাঁহার মতে:—

"The first thing is to get people to be of the same mind as regards

social evils. When once they are of this mind the evils will soon disappear"* ইহাই একমাত্র সদুপায়। এখনও সাধারণ লোকে অবরোধ প্রথাকে একটা ভয়ানক evil বলিয়া মনে করে না। সে পর্য্যন্ত না তাহাদের ভাবের পরিবর্ত্তন হইতেছে, সে পর্য্যন্ত কেহ কিছুই করিয়া উঠিতে পারিবে না। করিলেও তাহা আপনাদের সমাজের ন্যায় অকালপক্ক দোষে দূষিত হইবে। আমাদের বিশ্বাস আপনারা ভাল পথ ছাড়িয়া, বড় কাঁটাপথে অগ্রসর হইতেছেন।

শ্রীসত্যানন্দ শর্ম্মা।

* Companions of my Solitude.

বসন্তে।

১

মুঞ্জরি মুকুল রাজি, শোভিল গোকুলে আজি
দেখ লো স্বজনি।
মাতিয়া সুরভি-ফুলে, গুঞ্জরিল অলি কুলে,
বহিল মলয় তুলে, মৃদু মন্দ ধ্বনি।
সাজিল সুন্দরী আজি কুসুমে ধরণী।

২

কি শোভা গোকুলে সই, যমুনা পুলিনে, ওই,
নয়ন-রঞ্জন!
নূতন লাবণ্য রাশি, পরিয়া পুলকে ভাসি,
বনে বনে হাসাহাসি, করিছে কেমন!
লতায় পাতায় পরে কুসুম-ভূষণ।

৩

তোল লো স্বজনি তোল, কুসুমের ভার আজি
গাঁথিব মালায়।
অপরূপ রূপ ফাঁদে, সাজাইব শ্যামচাঁদে,
দিব গাঁথি নানা ছাঁদে, শ্যামের গলায়।
শোভিবে নিকুঞ্জে শ্যাম সুচারু শোভায়।

৪

দেখ ওই ঋতুরাজে, মদন মোহন সাজে
দেখা দিল আসি।

কানন বল্লরী মাঝে, কি সুন্দর সুবিরাজে,
বনদেবী রাণী তার—মাধুরীর রাশি!
হাসিছে কানন আজি প্রেমানন্দে ভাসি।

৫

শুনলো বিহঙ্গরবে, বসন্ত-উৎসবে, সবে,
মেতেছে গোকুলে।
স্বন স্বনে বহে বায়, মর মরে পাতা তায়,
ভ্রমরা গুঞ্জরে, গায় কোকিল আকুলে।
কল কলে কল্লোলিনী কালিন্দীর কূলে।

৬

আহা মরি কি মাধুরী নব কিসলয়ে, ওই
নবীন লতায়!
থেকে থেকে লতিকায়, নাচায় মলয় বায়,
জিনিয়া অলকা তায়, রাধার মাথায়।
শিখিপুচ্ছ নাচে যথা শ্যামের চূড়ায়।

৭

ডাকে ধীরি ধীরি কিবা মাধবী লতায়,ওই
সহকার শিরে!
পরিমল দূতী তার, আসিতেছে বার বার,
নীরবে রাধারে কি সে কহে ফিরে ফিরে।
লতিকার মান রাখি চল কুঞ্জে ধীরে।

৮

যমুনা পুলিনে আজ, বহে সমীরণ কত
সুধার লহরী।
পরশি কুসুম-কায়, সে লহরী নেচে যায়,
নাচিয়া তরঙ্গে ধায়---যমুনা সুন্দরী।
যথায় নিকুঞ্জ মাঝে নাচেন শ্রীহরি।

৯

সুখের সুখিনী তুমি, যমুনা সুন্দরি, ভাল-
বাসি লো তোমায়।
বহিলে তোমার তীরে, মধুর মলয় ধীরে,
দেখা দেন প্রাণ হরি বকুল তলায়।
নাচ তুমি সুরঙ্গিণি, তরঙ্গ-মালায়।

১০

তবে তুমি তরঙ্গিণি, একাকিনী কেন, আজ
বহ ধীরে ধীরে?
চললো নিকুঞ্জে চল, নাচায়ে তরঙ্গ দল,
নাচে যথা কুঞ্জমণি নিকুঞ্জ-সমীরে।
শোভিয়াছে বনফুল বনমালী-শিরে।

১১

ওই শুন পুন পুন ডাকিছে কোকিল, বনে
মধুর ঝঙ্কারে।
মরি কি সুধার রব! কেমনে পাসরি রব,
শ্যামের বাঁশরী যথা, ডাকে গো রাধারে।
চল তবে যাই সই নিকুঞ্জ-মাঝারে।

১২

আইল নিকুঞ্জে রাই, সখীগণ সনে, আজ
শ্যামের মিলনে।
রুণু রুণু নাচি যায়, বাজিছে বাঁশরী তায়,
গুঞ্জরি ভ্রমরা গায়, তরঙ্গিণী সনে।
কুসুম ভূষণ গায় ঝরে কুঞ্জ বনে।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসু।

কলিকাতা নামের উৎপত্তি।

কলিকাতা মহানগরীর ইতিহাস সম্বন্ধে কিছু লিখিবার উদ্যম করিতে হইলে, পূর্ব্বে "কলিকাতা" এই নামটি কিরূপে এবং কোন মূল হইতে উৎপন্ন হইল, সে বিষয়ে আমাদিগের অনুসন্ধিৎসু হওয়া নিতান্ত প্রয়োজনীয়। যে হেতু ইতিহাস-পাঠ-প্রিয় পাঠক মাত্রেরই মনে স্বভাবতঃ ইহা জানিবার জন্য ঔৎসুক্য জন্মিতে পারে। কিন্তু উক্ত বিষয় এরূপ গভীর তমসাচ্ছন্ন যে উহার আবরণ উদ্‌ঘাটিত করা অতীব দুরূহ। আমাদিগের দেশে ঐতিহাসিক গবেষণা যে কতদূর সুকঠিন তাহা অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি মাত্রেরই অবিদিত নাই। এই সকল বিষয়ে লিখিবার চেষ্টা করিতে হইলে অনেক সময়ে ইঙ্গরাজি পুস্তকের আশ্রয় ব্যতীত অন্য উপায় বিরল। ফলতঃ আমাদিগের পক্ষে ও অন্য পথ বিশেষ বিমুক্ত নহে। আমাদিগের অনুসন্ধানের পথে এইরূপ বাধা ও বিপত্তি বর্ত্তমান রহিয়াছে বটে, কিন্তু প্রমাণের সহায়তা গ্রহণ পূর্ব্বক ঐ সকল বাধা অতিক্রম করিয়া, সাধ্যমত যতদূর সম্ভব, সত্যে উপনীত হইবার চেষ্টা করা যাইবে।

১৫৯৬ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট্ আকবর সাহের প্রধান সচিব পণ্ডিত প্রবর সুবিখ্যাত আবুল-ফজল কর্ত্তৃক প্রণীত আইন-ই-আকবরী নামক গ্রন্থে কলিকাতা নামের প্রথম ঐতিহাসিক উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার পূর্ব্বে আর অন্য কোন ইতিহাসে কলিকাতার নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে সন্নিবেশিত তোদর মল্লের রাজস্বের তালিকায় (Rent Roll of Todur Mull) বঙ্গদেশ যে কয়েকটী বিভাগে বা সরকারে বিভুক্ত দেখিতে পাওয়া যায় তাহার মধ্যে কলিকাতা সাতগাঁও (সপ্তগ্রাম) সরকার (ক) বিভুক্ত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থে এইরূপ লিখিত আছে, যে মহাল কলিকাতা (খ) বারবাকপুর এবং বাকুয়ে মৌজাদ্বয় সহ

(ক) Sirkar Satgaon—A small portion only, the land between the Hugli and the Saraswati lay west of the Hugli, whilst the bulk of the Sirkar comprised the modern District of the 24 Parganahs to the Kabadak, western Nadiya, South-western Murshidabad and extended in the South to Hathiagarh below Diamond Harbour—*Vide Journal of the Asiatic Society of Bengal. Contributions to the Geography and History of Bengal—by H. Bolckman.*—P. 217.

(খ) আইন-ই-আকবরী পুস্তকে "কলিকাতা"কে "কলকত্তা বলিয়া লিখিত আছে। বেহার এবং উত্তর পশ্চিমাঞ্চল প্রভৃতি দেশের লোকেরা কলিকাতা শব্দ সেইরূপ উচ্চারণ করিয়া থাকে।

একত্রে বাৎসরিক ২৩,৪০৫ টাকা রাজস্ব স্বরূপ সাম্রাজিক কোষে সরবরাহ করিত। (গ) কোন কোন লেখক বলেন উপরোক্ত মৌজাদ্বয় সম্ভবতঃ শুতানটী গোবিন্দপুর হইবে।

আইন-ই-আকবরী রচিত হইবার পরে এবং বঙ্গদেশের সহিত য়ুরোপীয়দিগের সংশ্রব হবার পূর্ব্বে মুসলমান ইতিহাস লেখক দিগের বিরচিত কোন ঐতিহাসিক পুস্তকে "কলিকাতা" নামের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহা ব্যতীত ঐ সময়েরও এরূপ কোন বাঙ্গালা পুস্তক আমরা দেখিতে পাই নাই যাহতে উক্ত বিষয়ের উল্লেখ আছে; ফলতঃ উপরোক্ত মধ্যবর্ত্তী সময়ে এবং আইন-ই- আকবরীর পূর্ব্বে কলিকাতার বিষয় ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল। তৎপরে ভাগীরথী তীরে শুতানটী গ্রামে ইঙ্গরেজ বাণিজ্য কুঠি সংস্থাপনের কিছুদিনপরে ইংরাজী ইতিহাসে পুনর্ব্বার কলিকাতা উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এক্ষণে আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি যে উপরোক্ত বিষয় ব্যতিরেকে কলিকাতা সম্বন্ধে আমরা আর কিছু ঐতিহাসিক সাক্ষ্য পাইতেছি না। যদ্যপি আমরা উক্ত সামান্য ঐতিহাসিক সত্যকে আমাদিগের অনুসন্ধানের ভিত্তিমূল করিয়া অগ্রসর হইতে ইচ্ছা করি, তাহা হইলে আমাদিগকে এই স্থানে ঐ আশাকে জলাঞ্জলি দিয়া কলিকাতা নামের উৎপত্তির বিষয়ে অনুসন্ধানের চেষ্টা হইতে অবসর গ্রহণ করিতে হয়। সেই কারণ বশতঃ আমরা উক্ত সামান্য ঐতিহাসিক সত্যকে আশ্রয় করিয়া উহার সঙ্গে পরম্পরাশ্রুত কথা এবং যতদূর সাধ্য পৌরাণিক প্রমাণ লইয়া এই বিষয়ের অনুসন্ধানে চেষ্টিত হইব। যে সকল পুস্তকে কলিকাতা সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে, তাহাতে কলিকাতা নামের উৎপত্তি বিষয়ে যে মত দৃষ্ট হয় তাহা অপেক্ষা আমরা যে কিছু নূতন মতের আবিষ্কার করিব তাহা নহে। তবে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, উক্ত লেখকগণ তাঁহাদের মতের পোষকতার জন্য প্রমাণ সমূহ সন্নিবেশিত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টিত হয়েন নাই। এবং কেহ কেহ যাহা দিয়াছেন তাহা অত্যন্ত অপ্রচুর বলিয়া বোধ হয়। যাহাতে আমাদিগের পশ্চাল্লিখিত বিষয় সমূহের প্রমাণ ও সাক্ষ্য যথাযথ সন্নিবেশিত হইবার ত্রুটি না হয় তাহার সাধ্যমত চেষ্টা করা যাইবে। কলিকাতা নাম যে মূল হইতে উৎপন্ন বলিয়া আপাততঃ গ্রাহ্য উক্ত বিষয় বলিবার অগ্রে আমরা পাঠকদিগের গোচরার্থে উক্ত বিষয় সম্বন্ধীয়

(গ) 1. To this Sirkar (Satgaon) belonged mahall kalkatta (Calcutta) which together with two other Mouzahs, paid in 1582. a land revenue of Rs. 23,905—53 Mahals: revenue Rs. 418,118—*Vide Journal of the Asiatic Society of Bengal—Contributions to the Geography and History of Bengal—by H. Blochman.—P. 217.*

2. Sirkar Satgaon contg. 53 Mehals revenue 16,724,720 Dams Calcutta. Bakoowa and Barbakpur 3 Mehals revenue 936,215 Dams. *Vide Ayeen Akbery or the Institute of the Emperor Akbar. Translated from the original Persian by Fancis Gladwin vol. II. P. 191.*

কয়েকটি কৌতুকাবহ গল্প ও ভ্রম মূলক মত সন্নিবেশিত করিব।

১। কলিকাতা নামের উৎপত্তি বিষয়ে এইরূপ প্রবাদ আছে, (যাহা সম্ভবতঃ বাঙ্গালী আবাল বৃদ্ধ কাহারও অবিদিত নাই) যে, সর্ব্বপ্রথম একজন ইঙ্গরেজ কলিকাতায় আসিয়া আর অন্য কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া একজন তৃণছেদককে উক্ত স্থানের নাম জিজ্ঞাসা করেন। তাহাতে উক্ত তৃণছেদনকারী ইঙ্গরেজি ভাষায় সম্পূর্ণ অজ্ঞতা নিবন্ধন বুঝিতে না পারিয়া বিবেচনা করিল বোধ হয় সাহেব তাহাকে ঘাস কবে কাটা হইয়াছে তাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছে। ইহাতে সে উত্তর করিল "কাল কাটা" (অর্থাৎ কাল কাটা হইয়াছে।) সাহেব মনে করিল এই স্থানের নাম "ক্যাল-ক্যাটা"। (ঘ) এই কৌতুকাবহ গল্পটী যে রহস্যচ্ছলে কোন উর্ব্বরা মস্তিক প্রসূত সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। অতএব ইহা নিতান্ত অগ্রাহ্য।

২। কলিকাতা নামের উৎপত্তি বিষয়ে আমরা এস্থলে আর একটি কৌতুকাবহ ভ্রমমূলক মতের বিষয় উল্লেখ করিব। কোন একটি পুরাতন বঙ্গীয় চিহ্নিত কর্ম্মচারী সম্প্রদায় ভুক্ত পণ্ডিতাভিমানী ইঙ্গরেজ (ঙ) জনৈক গবেষণা প্রিয় বাঙ্গালী ভদ্রলোককে বলিয়াছিলেন যে কলিকাতা নাম "কলি চূর্ণ" হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। তিনি বলেন যে কলিকাতার সীমার মধ্যে অথবা উহার পার্শ্বে কোন স্থানে পূর্ব্বে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে কলিচূর্ণ প্রস্তুত হইত সেই হইতেই কলিকাতা নাম হইয়াছে। সম্ভবতঃ উক্ত ইঙ্গরেজ মহোদয় তাঁহার মাতৃভূমি শ্বেতদ্বীপ অর্থাৎ আলবিয়ান (Albion) নাম যে খটিকা পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন বলিয়া ইংলণ্ডীয় ইতিহাসে উল্লেখিত হইয়াছে; তাহাই তাঁহার চিন্তার বলবৎ থাকা প্রযুক্ত উক্ত মত প্রকাশ করিয়া থাকিবেন। এই রূপ মত ইংরেজী উপন্যাস লেখক চূড়ামণি চার্লস ডিকেনসের মস্তিষ্ক প্রসূত প্রত্নতত্বানুসন্ধায়ী পিকুইক সাহেবের গবেষণা সম্ভূত হওয়াই সম্ভব। ইহা ব্যতীত উক্ত বিষয়ে আমরা আর অধিক কিছু বলিবনা।

৩। লং সাহেব বলেন কলিকাতার নাম সম্ভবতঃ মহারাষ্ট্র খাত (Meharatta ditch) অর্থাৎ খাল কাটা হইতে উদ্ভূত হইয়া থাকিবে। (চ) মহারাষ্ট্র খাত ১৭৪২

(ঘ) কলিকাতার ন্যায় শ্রীরামপুরের নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে ও ঐরূপ কাল্পনিক মত প্রচলিত আছে—

শ্রীরামপুর সম্ভবতঃ শ্রীরাম নামক কোন ব্যক্তি হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকিবে। কিন্তু এইরূপ প্রবাদ আছে যে, যে সময়ে উক্ত স্থান দিনেমারদিগের উপনিবেশ ছিল, সেই সময়ে ভিক্ষুকগণ ভিক্ষা যাচিঞা করিলেই লোকে কহিত "Sir I am poor তাহাতেই শ্রীরামপুরের নাম হইয়াছে। ঐরূপ হাবড়া সম্বন্ধে ও প্রবাদ প্রচলিত আছে। উক্ত বিষয় বোধ হয় কোন পাঠকের অবিদিত নাই। অতএব এ স্থানে উহার উল্লেখ করা বাহুল্য মাত্র।

(ঙ) কোন বিশেষ কারণ বশতঃ আমরা উক্ত সাহেবের নাম এস্থলে উল্লেখ করিতে বিরত হইলাম।

(চ) Vide "Selection from the Calcutta Review"—article Calcutta in the olden times—its localities—vol. V. P. 169.

খ্রীষ্টাব্দে খাত হয়। লং সাহেব বলেন, উক্ত সময়ের পূর্ব্বে কলিকাতা নামের উল্লেখ কোন স্থানে নাই। এই মতটি তাঁহার সম্পূর্ণ ভ্রমমূলক। যে হেতু ১৭১৭ খৃষ্টাব্দে সম্রাট ফরোকসায়ার ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে যে ফারমান (ছ) দেন তাহার মধ্য পরগণা আমিনাবাদের অন্তর্গত কলিকাতা, শুতানুটী এবং গোবিন্দপুরের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ফলতঃ খালকাটা হইতে যে কলিকাতা নামকরণ হয় নাই তাহা সম্পূর্ণ রূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে।

৪। পরলোকগত রাজা সার রাধাকান্ত দেব বাহাদুর যৎকালে তাঁহার শেষ অবস্থায় বৃন্দাবন ধামে অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেই সময়ে তিনি এক খানি স্তবের পুস্তক (জ) কলিকাতায় মুদ্রাঙ্কিত করান। উক্ত পুস্তকের অভিধান পত্রিকায় কলিকাতার পরিবর্ত্তে কিলকিলা নগর দিয়াছেন। কিলকিলা শব্দার্থে হর্ষধ্বনি বা কোলাহল বুঝায়। কলিকাতাকে কিলকিলা নামে অভিহিত হইতে কোন পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায় না, এবং এই শব্দ কোথা হইতে কিরূপে আসিল তাহারও প্রমাণ আমরা কিছু দিতে পারি না কেবল মাত্র এই পর্য্যন্ত আমরা অবগত আছি যে, সার উইলিয়ম জোনস্

(ছ) Vide Translation of the *Firman* obtanied from Emperor Ferokshere 1717 A. D. History of the rise and progress of the Bengal Army by Captn. Arthur Broome—Apendix. c. P. VII. L. 29 to 31.

(জ) প্রণাবলী নামক স্তবের পুস্তক ১৯২৩ সম্বৎ ১৭৮৮ শকাব্দা, ১২৭৩ বঙ্গাব্দে মুদ্রিত।

তাহার জনৈক বন্ধুকে যে এক পত্র লিখেন উক্ত পত্রে (ঝ) তিনি কলিকাতাকে যে নামে অভিহিত করিয়াছেন, তাহাতে কলিকাতার নাম কিল কিলা শব্দের অনেকটা নৈকট্য বলিয়া বোধ হয়। এই শব্দের বিষয় আমরা আর অধিক কিছু অবগত নহি। সম্ভবতঃ এই শব্দটি ভ্রম মৌলিক হইবে।

৫। জনৈক ওলন্দাজ ভ্রমণকারী কলিকাতা নগরকে গলগোথা Golgotha (ঞ) অর্থাৎ

(ঝ) Vide letter of Sir Wm. jones to the late Samuel Davis Dated 20 October 1792—"We are just arrived my dear sir, at the town of *Cali* (কালি=বিবাদ) or contention (which is the proper name, and *a very proper one*, of Calcutta)—Transaction of the Royal Asiatic Society. vol. III. P. 23.

(ঞ) Calvary—skull—(La XXIII. 33. called Galgotha John XIX. 17.) was the name given to a slight elevation north of the ancient city of Ierusalem, perhaps half a mile distant from the temple. The spot now so called is within the walls of the modern city. It was called *Golgotha or the place of Skull*, either from its shape or from the circumstance that it was the usual place of executing criminals. The first of these opinions is the more likely. The name is explained in "Mathew, nor as a place of skull or as having any reference to a scene of ordinary public execution, but as "a place of skulls" as if the locality had borne some resemblance in its elevation to this portion of the human body.—*Vide Eadies Biblical Cyclopadia P. 83.*

"নর কপাল সমাকীর্ণ স্থান" নামে অভিহিত করিয়াছেন। কথিত আছে যে কলিকাতার সঙ্গে য়ুরোপীয়দিগের সংস্রব হইবার আরম্ভ কালে, কোন সময়ে, কলিকাতাবাসী য়ুরোপীয়দিগের মধ্যে মৃত্যুর সংখ্যা এত অধিক হইয়াছিল যে এক বৎসরের মধ্যে উহাদিগের চতুর্থাংশ লোকের মৃত্যু হয়, এবং কলিকাতাস্থ অপর অপর জাতিগণেও সংখ্যা অনুসারে কাল কবলিত হইয়াছিল। এবং ক্রমান্বয়ে সপ্ততি বৎসর কাল মৃত্যুর সংখ্যা অধিক হওয়া প্রযুক্ত ভাগীরথী তীর নর কপালে সুশোভিত হইয়া থাকিত। সেই কারণ বশতঃ যে সকল য়ুরোপীয়নাবিকগণ (বিশেষতঃ ওলন্দাজগণ) উক্ত স্থান অতিক্রম করিয়া যাইত তাহারা উক্ত দৃশ্য দর্শন করিয়া স্বভাবতঃ বিবেচনা করিত যে কলিকাতা নাম গলগোথা হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকিবে। (ট)

কলিকাতা নামের উৎপত্তি বিষয়ে যে কয়েকটি মত পূর্ব্বে সন্নিবেশিত হইল, তাহার মধ্যে কোনটিও যুক্তি সঙ্গত নহে। ঐ সকল মত সমর্থনের পক্ষে যে প্রমাণের সম্পূর্ণ অভাব এবং ঐ সকলের যুক্তিগুলিও যে গ্রাহ্য নহে তাহা আমরা সাধ্যমত দেখাইবার চেষ্টা করিতে ত্রুটি করি নাই। এক্ষণে আমাদিগের দেখিতে হইবে যে কলি

(ট) Vide (1) Imperial Gazetteer of India Vol. II. P. 317 by W. W. Hunter.

(2) Vide Selections from the Calcutta Review Article—Calcutta in the olden times—its localities Vol. V P. 168. by Rev. J. Long.

কাতা নাম কোন মূল হইতে উৎপন্ন হইল। পূর্ব্বেই আমরা বলিয়াছি যে উক্ত বিষয়ে কলিকাতা সম্বন্ধীয় লেখকদিগের সাধারণ প্রচলিত মত হইতে আমাদিগের মত বিশেষ বিভিন্ন হইবে না। কিন্তু এস্থলে বলা আবশ্যক যে যদিও আমরা কতকগুলি প্রমাণের সহায়তায় উক্ত মতের পোষকতা করিতে অনেকটা কৃতকার্য্য হইতে পারি তথাচ আমাদিগের এইরূপ আশঙ্কা রহিল যে ভবিষ্যতে কোন গবেষণা প্রিয় মহোদয় কর্ত্তৃক উক্ত মত খণ্ডিত হইয়া কলিকাতা নামের উৎপত্তি বিষয়ে কোন একটি নূতন মতের প্রচার হইতে পারে। সে যাহাই হউক যখন এ বিষয়ে অন্য কেহ নূতন মত প্রমাণ করিতে অসমর্থ এবং যাবৎ অন্য কেহ অখণ্ডনীয় প্রমাণ ও যুক্তি সহ কোন নূতন মতের প্রচার না করেন তাবৎকাল আমাদিগকে এই মত গ্রাহ্য করিয়া লইতে হইবে।

ইতিহাস পাঠক মাত্রেই বিদিত আছেন যে হয় কোন সুবিখ্যাত ব্যক্তি কিম্বা কোন কীর্ত্তিস্তম্ভ অথবা কোন যুদ্ধাদি ও অপরাপর ঘটনা মূলক স্থান, না হয় নিকটবর্ত্তী দেবতাদিগের স্থান প্রভৃতি হইতেই সচরাচর নগরাদি নাম গ্রহণ করিয়া থাকে। য়ুরোপ খণ্ডে ও এই রূপ স্থান সমূহ হইতে নগরাদির নামোৎপত্তি হইতে দেখিতে পাওয়া যায় (ঠ) এক্ষণে আমাদিগের দেখা আবশ্যক

(ঠ) We find that in Europe various cities receives their names from the circumstance of monasteries and castles having been first erected on a spot which formed the necleus of a town, as English

যে (১) উপরোক্ত কয়েক প্রকার স্থানের মধ্যে কোন শ্রেণীর স্থান কলিকাতার সন্নিকটে আছে কিনা এবং (২) যদ্যপি থাকে তাহা হইলে কলিকাতা নামোৎপত্তির পূর্ব্বে উক্ত স্থানের অস্তিত্ব ছিল কিনা এবং যদ্যপি থাকে তাহা হইলে উহা কি? প্রথম প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে বলা যাইতে পারে যে কলিকাতা সন্নিকটে তিনটি সুবিখ্যাত দেবতা স্থান বর্ত্তমান রহিয়াছে। প্রথমটি কালীঘাটের কালী দ্বিতীয়টি বাগবাজারের সিদ্ধেশ্বরী কালী এবং তৃতীয়টি চিৎপুরের চিত্রেশ্বরী কালী। তিনই কালী তিনই সুবিখ্যাত এবং তিন স্থানেই নর বলী হইত এবং ডাকাইতগন ডাকাতি করিতে যাইবার পূর্ব্বে তিন স্থানেই কৃতাঞ্জলি পুটে কালীর পূজা অর্পণ করিত। আমাদিগের দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর স্থির করিতে হইলে দেখিতে হইবে এই তিনটি দেবালয় হইতে কোনটি সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ও সুবিখ্যাত ও তাহা হইতে কলিকাতার নাম উৎপন্ন হইতে পারে কিনা? এই দুই পূর্ব্বপক্ষ সিদ্ধান্ত হইলে ব্রীটিশ রাজধানী কলিকাতা নাম গ্রহণ নির্ব্বিবাদে স্থিরীকৃত হইতে পারে। চিত্রেশ্বরি কালী নিতান্ত আধুনিক সময়েরনাহইলে ও দুইতিন শতাব্দীর পূর্ব্বে উহার বিষয় কোন পুস্তক লিখিত হইয়াছে কিনা জানা যায় না, অথবা উহার নাম কোন পুরাণাদিতে পাওয়াযায়না। কলিকাতার অথবা আইন-ই-আকবরীর পূর্ব্বে উহার অস্তিত্ব ছিল কিনা সন্দেহ। উহা কালী মূর্ত্তী বটে কিন্তু চিত্রেশ্বরী বলিয়াই বিখ্যাত। অতএব উহা হইতে যে কলিকাতা নাম গ্রহণ করিয়াছে ইহা সম্ভব নহে। বাগবাজারস্থ কালী চিত্রেশ্বরী হইতে আরও আধুনিক এবং ইহা সিদ্ধেশ্বরী নামেই বিখ্যাত ফলতঃ ইহা হইতে ও কলিকাতা নাম প্রাপ্তির সম্ভাবনা দেখা যায় না। এক্ষণে নির্ব্বিঘ্নে বলা যাইতে পারে যে কলিকাতা নাম কালীঘাটের কালী হইতে উৎপন্ন হওয়া সম্পূর্ণ সম্ভব। ইহার সমর্থনের জন্য অন্যান্য কারণ পশ্চাতে দেখান হইবে। এস্থলে বলা আবশ্যক যে নিকটবর্ত্তী অল্প বিখ্যাত স্থান হইতে না হইয়া দুরবর্ত্তী অধিকতর সুবিখ্যাত স্থানহইতে ও নগরাদি অনেক সময়ে নাম গ্রহণ করিয়া থাকে (ড)।

উক্ত মতের পোষকতার জন্য কালীঘাটের প্রচীনত্ব সাব্যস্ত এবং অন্যান্য প্রমান সমূহ সন্নিবেশিত করিবার পূর্ব্বে কালীঘাট এবং উহার পীঠত্ব সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ ইতিহাস এস্থলে বিবৃত করা আমাদিগের নিতান্ত প্রয়োজনীয়। কালীঘাট এক্ষণে যে স্থানে অবস্থিত, কোন প্রত্নতত্বানুসন্ধায়ী পণ্ডিত বলেন যে পুরাণাদিতে এই স্থানের নাম উল্লেখ আছে এবং অতীব প্রাচীন কাল হইতে এই স্থানটি লোকে অবগত আছেন। উক্ত স্থানকে তৎকালে হিন্দুগণ কালীক্ষেত্র বলিতেন।

words ending in *chester* (castra) show. In the middle ages this occurred very frequently. *Vide Selection from the Calcutta Review Vol. V.—P. 168.*

(ড) "The field of Waterloo is named from the *largert* village near it and not St. Jean, which is still nearer. *Vide Selections from the Calcutta Review Vol. V. P. 169.*

ইহা বেহুলা হইতে দক্ষিণেশ্বর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আধুনিক কলিকাতাও উক্ত সীমার মধ্যে ছিল। এবং উক্ত স্থান একটি বিখ্যাত পীঠ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। পুরাণাদিতে এই রূপ কথিত আছে যে কালীক্ষেত্রের সীমার মধ্যে কোন স্থানে সতীর মৃত দেহের অংশ পতিত হয় (ঢ)। এতদ্দেশে সাধারণতঃ ৫১কান্ন এবং কেহ কেহ বাহান্ন পীঠের উল্লেখ করিয়া থাকেন। পুরাণাদিতে বাহান্ন পীঠেরই উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু পীঠ সম্বন্ধে পুরাণাদিতে সময়ে সময়ে মতভেদও লক্ষিত হয়। দেবী-ভাগবতে (ণ) পীঠের সংখ্যা অনেক গুলি দেখিতে পাওয়া যায়।

আবার যদ্যপি আমরা কালিকাপুরাণের কথা বিশ্বাস করি, তাহাহইলে পীঠের সংখ্যা সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। উক্ত পুস্তকে পীঠের তালিকা মধ্যে কালীঘাটের নাম পর্য্যন্ত উল্লেখ নাই, উহা নিম্নে টিকায় সন্নিবেশিত হইল (ত)। ইহা ব্যতীত অন্যান্য তন্ত্রে (থ) ইহার বিষয় উল্লেখ আছে। ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের কৃত অন্নদামঙ্গলে পীঠমালা-শীর্ষক পদ্যে কালীঘাট একটি পীঠ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। উহাতে বুঝা যায় যে এক্ষণে যে স্থানে নকুলেশ্বরের মন্দির অবস্থিত, উক্ত স্থানেই সতীর দেহের অংশ পতিত হয় (দ)। এক্ষণে বিলক্ষণ দেখা যাইতেছে যে পুরাণাদিতেও পীঠ-সম্বন্ধে বিশেষ মতভেদ। এইরূপ স্থলে আমরা কোন্‌টিকে পরিত্যাগ

(ঢ) Calcutta is a place known from remote antiquity. The ancient Hindus called it by the name of kalikshetra—It extended from *Bahula* to *Dakhineshar.* Behula is modern Behala and the site of Dakhineshar still exists. According to the Purans, a portion of the mangled corpse of *Sati* or *Kali* fell some where within that boundary; whence the place was called *Kalikhetra.* Calcutta (Kalikatra) is a corruption of *Kalikhetra.* In the time of Balal Sen it was assigned to the descendants of *Sera. Vide Indian Antiquary* Pandit Padmanav Ghoshal's letter, dated Calcutta July. 1873.

(ণ) দেবীভাগবৎ ৭ম স্কন্ধ নানা পীঠকথা দেখ।

ত। কালিকা-পুরাণ দেখ ১৮ অধ্যায়।

১। দেবীকূট—পাদযুগ।
২। ওড্রির—উরুযুগ।
৩। কামরূপ—যোনি।
৪। ঐ—নাভি।
৫। জালন্ধ—স্তনযুগ স্বর্ণহার সহিত।
৬। পূর্ণগিরি—শির।
৮। মন্দাকিনী (স্বর্গঙ্গা) অবশিষ্টাঙ্গ।

৬১ অধ্যায়।

১। ওড্র— { ১ পশ্চিমাংশে উড্রেশ্বরী। ২ জগন্নাথে ওড্রেকাত্যায়নী।
(২)। জালশৈল—জালেশ্বরী।
৩। পূর্ণপীঠ—পূর্ণেশ্বরী।
৪। কামরূপ—কামেশ্বরী।

(থ)। উত্তর তন্ত্র, বৈকবী তন্ত্র, ত্রিপুরা তন্ত্র উক্ত—

(দ)। কালীঘাটে চারিটি অঙ্গুলী ডানিপার।
নকুলেশ ভৈরব কালিকা দেবী তার॥
ভারত চন্দ্র রায় গুণাকর কৃত
অন্নদামঙ্গল।
পীঠমালা-শীর্ষক পদ্য দেখ।

করিয়া কোন্‌টিকে বিশ্বাস করিব, তাহা স্থির করা সুকঠিন। একটিকে বিশ্বাস করিলে কালীঘাট পীঠের মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে, আবার অন্য আর একটির লেখার উপর আস্থা করিলে, উক্ত স্থানকে পীঠের সংখ্যার বহির্ভূত বিবেচনা করিতে হয়। ইহাব্যতীত আমাদিগের দেশে পুরাণের সংখ্যা এত অধিক হইয়া পড়িয়াছে যে উহার মধ্যে কোন্‌টি আধুনিক এবং কোন্‌টি প্রাচীন, ইহা নির্ব্বাচন করা অতীব দুরূহ ব্যাপার সুতরাং আমরা এস্থলে কালীঘাট একটি পীঠ কিনা সে বিষয়ের মীমাংসা হইতে আপাততঃ বিরত হইলাম। সময়ান্তরে এবিষয়ের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইবার ইচ্ছা রহিল। মূল প্রস্তাবের কতকটা সহায়তা হয় বলিয়াই আমরা এবিষয়ের কথঞ্চিৎ উল্লেখ করিলাম, নচেৎ এস্থলে এবিষয়ের অবতারণা করিবার বিশেষ আবশ্যকতা ছিলনা। ফলে কালীঘাট একটি মহাপীঠ বলিয়া আমাদিগের দেশের লোকের মনে বদ্ধমূল থাকা প্রযুক্ত আমরা ও আপাততঃ উক্ত স্থানকে একটি পীঠ বলিয়া গ্রাহ্য করিয়া লইলাম।

এক্ষণে দেখা যাউক কালীঘাট প্রাচীন কি আধুনিক স্থান। আমাদিগের দেশে প্রত্নতত্ত্বসম্বন্ধে অনুসন্ধানের বিশেষ উদাসীনতার জন্য অন্যান্য স্থানের ন্যায় এই স্থানের বিশেষ প্রাচীন বিবরণ অবগত হইবার উপায় নাই। বল্লাল সেনের সময়ে এ স্থানের উল্লেখ কোন পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায় (ধ)। এই সময় হইতে সম্রাট আকবরের রাজত্ব আরম্ভ হওয়া পর্য্যন্ত আমরা এই স্থানের বিষয় আর কিছু অবগত নহি। সম্ভবতঃ আকবরের রাজত্ব কালেই কালীঘাট ও কলিকাতা অঞ্চলের অবস্থা ক্রমশঃ অবনত হইতে আরম্ভ হয়। গৌড়ীয় ভাষা তত্ত্বে উল্লিখিত আছে যে ১৫৮৫ অব্দে বেলা প্রায় তিন ঘটিকার সময় ভয়ানক ঝড় ও উদ্বেলিত সমুদ্রের আক্রমণে দক্ষিণ প্রদেশ নষ্ট হইয়া যায়। প্রায় দুইলক্ষ প্রাণীর প্রাণ বিনষ্ট হয়। একটি মন্দির অবলম্বন করিয়া কতকগুলি লোক রক্ষা পায়। তৎপরে ঘোর ভূমিকম্প হইয়াছিল। গঙ্গার অসংখ্য শাখায় বেগ পরিবর্ত্তিত হইয়া অনেক স্থান নষ্ট হইয়া যায়। তদবধি দক্ষিণ দেশ ক্রমশঃ অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিল। যে দুই একজন অধিবাসী ছিল, তাহারাও মগদিগের(ন) উৎপাতে বাসস্থান পরিত্যাগ করে। প্রায় দুই শতাব্দী হইল সুন্দরবন পূর্ণ অরণ্যে পরিণত হইয়াছে (প)।

অনেকে বিদিত আছেন যে সুন্দরবন যে আংশিক আবাদ হইয়াছে, ঐ স্থানের মধ্যে অনেক স্থলে হর্ম্ম্য মন্দির প্রভৃতির ভগ্নাবশেষ এবং ইষ্টকাদিগ্রথিত সোপান-পরিশোভিত পুষ্করিণী সমূহ বাহির হইয়াছে। ঐ সকল বর্ত্তমানথাকাপ্রযুক্ত বিবেচনা হয়, যে ঐ স্থানে এক সময়ে সমৃদ্ধিশালীনগরাদি ছিল, কোন দৈব ঘটনা বশতঃই যেঐ সকলের ধ্বংশ

(ধ) গৌড়ীয় ভাষাতত্ত্ব প্রথম খণ্ড ৫০ পৃষ্ঠা দেখ।

(ন) মগ অর্থাৎ আরাকাণ প্রভৃতি প্রদেশীয় লোক পোর্ত্তুগিজদিগের সঙ্গে সম্মিলিত হইয়া বোম্বাটিয়ার বা জলদস্যুর কার্য্য করিত। তাহাদিগের দ্বারায় বঙ্গদেশের সমুদ্রতীরস্থ স্থানসমূহ লোকের অনেক অনিষ্ট সাধিত হইয়াছিল।

(প) গৌড়ীয় ভাষা-তত্ত্ব প্রথম খণ্ড ৪৭ পৃষ্ঠা দেখ।

হইয়াছে, তাহার বিলক্ষণ সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। ঐ সকল নগরাদি ভগ্নাবশেষে লোক-পরিশূন্য হইয়া ক্রমশঃ অরণ্যেপরিণত হয়, এমন কি কাল সহকারে ঐ বনের সীমা কলিকাতাপর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। বর্ত্তমান কালীর মন্দিরের প্রাচীণত্ব বিষয়ে বিশেষ মতভেদ আছে। আলিপুরে ১৮৮৫। ২৩সে জুন মঙ্গলবার এক মকর্দ্দমা হইয়া গিয়াছে, তাহাতে মকর্দ্দমার বাদী বড়িষার সাবর্ণ চৌধুরীগণ বলিয়া ছিলেন, যে, বর্ত্তমান মন্দির ইং ১৮০৯। ১০ সালে (বাঙ্গালা ১২১৬ সালে) নির্ম্মিত। বড়িষানিবাসী জনৈক বিজ্ঞ প্রাচীন ব্যক্তির নিকট আমরা শুনিয়াছি যে পূর্ব্বে অরণ্যান্তর্গত একটি কাষ্ঠ-নির্ম্মিত সামান্য মন্দিরের মধ্যেকালী স্থাপিত ছিলেন। অনেকেই কালীপ্রসাদী হাঙ্গামের (ফ) বিষয় অবগত থাকিবেন। সেই হেতু উক্ত বিষয় এস্থলে বিবৃত করিবার আবশ্যক হইতেছে না। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, এ সময়ে সাবর্ণ চৌধুরী মহাশয়েরা যে মুদ্রা গ্রহণ করেন(ব) সেই মুদ্রা দ্বারায় প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ বর্ত্তমান কালীর মন্দির নির্ম্মিত হয়। অন্যত্র হন্টার সাহেব বলেন যে উক্ত মন্দির প্রায় তিন শতাব্দী পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছে (ভ) কোন লেখক বলেন যে সম্ভবতঃ ঐ মন্দির অনেক শতাব্দী হইতে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ঐ সময়ে গঙ্গা (ভাগীরথী) অত্যন্তপ্রশস্ত ছিল এবং উহা উক্ত মন্দিরনিঃসৃত নরশোণিত, মন্দির-প্রাচীর বিধৌত করিয়া কল কলস্বরে প্রবাহিত হইত। দস্যুগণ তাহাদিগের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে দেবীর সম্মুখে পূজা অর্পণ করিত। "হলওয়েল সাহেব ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে লিখিয়াছেন যে, কালীঘাটে কালীর প্রাচীন মন্দির দণ্ডায়মান রহিয়াছে এবং উহার নিম্নে একটি ক্ষুদ্র নদী প্রবাহিত। উক্ত স্রোতকে ব্রাহ্মণগণ গঙ্গার আদিস্রোত বলিয়া থাকেন" (য)।

উপরে কালীঘাট-সম্বন্ধে যাহা উল্লিখিত হইল, তাহাতে বুঝা যাইতেছে যেএই স্থানটী প্রাচীন এবং সুপ্রসিদ্ধ, বহুপূর্ব্বে ইহার উন্নত অবস্থা ছিল। সম্ভবতঃ সেই সময়ে প্রাচীন মন্দির ছিল এবং উহার নিম্নে টালির খালের Tally nulluh অধিকৃত স্থানে প্রশস্ত পুণ্যসলিলা ভাগীরথী প্রবাহিত ছিল। তৎপরে পূর্ব্বোক্ত দুর্দ্দৈববশতঃ যে সময়ে ঐ সকল প্রদেশের অনিষ্টপাত হয়, সেই সময়ে উক্ত মন্দিরও বিনষ্ট হইয়া থাকিবে এবং ক্রমশঃ ঐ সকল স্থান অরণ্যে পরিণত হইলে, সম্ভবতঃ কাষ্ঠের সামান্য মন্দিরে কালী দেবীর প্রতিমূর্ত্তি রক্ষিত হইয়া ছিল। পশ্চাতে উপরোক্ত ঘটনাতে আধুনিক মন্দির নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে এবং এতদ্দেশে ইংরেজাগমনের পর হইতে কলিকাতা নগরের ক্রমিক উন্নতিসহকারে কালীঘাট প্রভৃতি অঞ্চলেরও উন্নতি হইতে আরম্ভ হয়।

(ফ) উক্ত বিষয় যদ্যপি কাহার বিশেষরূপ অবগত হইবার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে তিনি অনুগ্রহপূর্ব্বক হুতুম পেঁচার নক্সা পাঠে এবং প্রাচীন লোক দিগের নিকটে অবগত হইতে পারেন।

(ব) ঐ মুদ্রার সংখ্যা আমরা বিশেষ অবগত নহি। সম্ভবতঃ দশ সহস্র হইবে।

(ভ) Vide W. W. Hunter's Statistical Report. Vol. P.

(য) Vide Holwell's Indian Tracts.

যখন দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে কালীঘাট বহু পূর্ব্ব হইতে একটি সমৃদ্ধিশালী স্থান এবং এই স্থানব্যতীত কলিকাতার সন্নিকটে ইহা অপেক্ষা অন্য কোন সুপ্রসিদ্ধ স্থান পরিলক্ষিত হয় না, তখন আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে, যে "কালীঘাট" অথবা "কালী" মূলব্যতীত অন্য কোন মূল হইতে কলিকাতা নামোৎপত্তি সম্ভব নহে।

অনেক সময়ে স্থানের নাম প্রথমে যাহা থাকে তাহা হইতে ক্রমশঃ অপভ্রষ্ট হইয়া পড়ে। ইহা ইতিহাস পাঠকের অবিদিত নাই। সেইরূপ কলিকাতা-শব্দ "কালী" বা "কালীঘাট" হইতে বর্ণ-বিপর্য্যয় (বর্ণেরযোগ বিয়োগ বা পরিবর্ত্তন) ঘটিয়া কিরূপে যে অপভ্রষ্ট হইয়াছে, তাহা স্থির করা অতীব দুরূহ। কোন কোন লেখক বলেন যে "কালীকুট্ট" (কালী — কালীর, এবং কুট্ট, — দুর্গ) হইতে উৎপন্ন হইয়াছে (র)। কেহ বলেন যে কলিকাতা নাম কালীঘাটের অপভ্রংশ মাত্র (ল) এবং কেহ বা কলিকাতাকে "কালী" কোটা নামে অভিহিত করিয়াছেন (ষ)। অনেক প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধায়ী কলিকাতাকে কালীক্ষেত্রের অপভ্রংশ করিয়াছেন (শ)।

পরিশেষে আমরা আর দুই একটি কথা বলিয়া এই প্রস্তাবের শেষ করিব। "কালী" বা "কালীঘাট" হইতে কলিকাতার নাম কে দিল? মুসলমান, ইঙ্গরেজ(য়ুরোপীয়) কিম্বা হিন্দু প্রথমতঃ সম্রাট্ আকবর সাহেব সময়ে যে যে স্থানে হিন্দুদিগের সুবিখ্যাত দেবাদি প্রতিষ্টিত ছিল, ঐ সকল দেবতা ও স্থানের নাম আইন-ই-আকবরীতে সন্নিবেশিত দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু উক্ত পুস্তকে কালীঘাটের কোন উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। আইন-ই-আকবরীর পূর্ব্বে এবং পশ্চাতে ভারতে য়ুরোপী ঐতিহাসিক কালের প্রারম্ভপর্য্যন্ত কোন মুসলমানীয় ইতিহাসে ও উক্ত স্থানের নামোল্লেখ নাই। ইহাতে বোধ হইতেছে, যে সময়ে আইন-ই-আকবরী রচিত হয়, সে সময়ে কালীঘাটের অত্যন্ত হীন অবস্থা। তাহা না হইলে উক্ত পুস্তকে কলিকাতার নাম দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, অথচ কালীঘাটের উল্লেখ মাত্র নাই। ইহা দ্বারায় অনুমিত হইতেছে যে কলিকাতার পূর্ব্ব অবস্থা মন্দ হইয়াছিল। ইহাতে বিলক্ষণ প্রতীয়মান হইতেছে আইন-

(র) "Kalcutta, Kal-kut-ta, a city of Bengal and the capital of Britisth India standing on the East Bank of the Hugli River, at the distance of 100 miles from the Bay of Bengal. It takes its name from Cali or Kalee the Hindu goddess of Times and Catta "a house or temple," which stood in the village of Calcutta"—*Vide Beeton's Dictionary of Geography a universal Gazetteer—P. 186.*

(ল) "Calcutta, Sans: is from Kalika (Kalee) and "ষt" to move. It was when they (British) obtained it, only a miser able village known as Kalighat, of which some believe its present name is a corruption"—*Vide Balfour's Cyclopædia of India.*

(ষ) Vide Stewarts History of Bengal P. 340 and 346.

(শ) Calcutta. (Kalikata) is a corruption of Kalikshetra—Vide note (চ)

ই-আকবরীর বহুপূর্ব্বে অথচ কালীঘাটের উন্নত অবস্থায় কলিকাতা নাম প্রদত্ত হইয়াছিল। তাহা হইলে প্রমাণ হইতেছে, মুসলমানদিগেরদ্বারা কলিকাতার নামকরণ হয় নাই।

দ্বিতীয়তঃ লংসাহেব বলেন (স) "হুগলী-নগরে ইঙ্গরেজ বণিকগণের উপনিবেশ স্থাপিত হইবার অর্দ্ধশতাব্দী পরে যখন জব্ চার্ণক সাহেব ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দে ২৪ আগষ্ট তারিখে সুতানটী গ্রামে পদার্পণ করেন এবং বৈটকখানাস্থিত বিখ্যাত পুরাতন বৃক্ষের মূলে বসিয়া তাম্রকূট (পাইপ) সেবন করেন; যে সময়ে চৌরঙ্গী ব্যাঘ্রভল্লুকের আবাসভূমি অরণ্যে পরিবৃত; সম্ভবতঃ সেই সময়ে তিনি কলিকাতার নিকটে কালীঘাটব্যতীত অন্য গণনীয় স্থান দেখিতে না পাওয়াতে, উক্ত স্থান হইতে কলিকাতার নাম প্রদান করেন। লং সাহেবের এই অনুমান সম্পূর্ণ ভ্রম-মূলক। যে হেতু ভারতবর্ষের সঙ্গে য়ুরোপীয়দিগের সংশ্রব হইবার পূর্ব্বে যখন আমরা কলিকাতার নাম আইন-ই-আকবরীতে প্রাপ্ত হইতেছি তখন ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? ফলতঃ এই নাম য়ুরোপীয়দিগেরও দ্বারায় প্রদত্ত হয় নাই।

তৃতীয়তঃ যখন দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, যে মুসলমান এবং য়ুরোপীয় উভয়ের কাহারও দ্বারা কালীঘাট হইতে কলিকাতা নাম দেওয়া হয় নাই, এবং যখন কলিকাতার নাম আইন-ই-আকবরীতে উল্লেখ-রহিয়াছে, তখন ইহা বুঝিতে হইবে যে উক্ত স্থান কিছু সহসাই উৎপন্ন হয় নাই অবশ্যই উহা পূর্ব্বহইতেই বর্ত্তমান ছিল। অতএব প্রতিবাদ-ভীতিশূন্য হইয়া বলা যাইতে পারে, যে এই নাম মোগল-সাম্রাজ্য স্থাপিত হইবার বহুপূর্ব্বে সম্ভবতঃ বঙ্গে মুসলমান সমাগমের অগ্রে কালীঘাটের উন্নত অবস্থায় হিন্দুদিগের দ্বারায় প্রদত্ত হইয়াছিল।

শ্রীঅঘোরনাথ দত্ত।

(স) "When Gob charnock landed on the 24th of August—1690, fifty years after the first settlement of the English at Hugli, and smoked his pipe probably under the Shade of the famous old tree that stood at Baitakhana, chowrunghee plain was a dense forest, the abode of bears and tigers: a few weavers shade stood where Chandpal ghat is now: there was consequently no object of interest nearer than Kalighat. It is not likely then, that the old patriarch called the locality after the most conspicuous object. *Vide Selections from the Calcutta Review Vol. V. Page 168 and 169.*

বাল্য-বিবাহ।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

হিন্দুপত্নী।

নবজীবনের "হিন্দুবিবাহ" প্রস্তাবলেখক, হিন্দুবিবাহকে আধ্যাত্মিক বলিয়াই ক্ষান্ত হয়েন নাই। তিনি হিন্দুবিবাহের গৌরব বাড়াইবার জন্য আরও যে কত বলিয়াছেন তাহার ক্রমে ক্রমে পরিচয় দিতেছি। হিন্দু-বিবাহ আধ্যাত্মিক, হিন্দুবিবাহের উদ্দেশ্য পারলৌকিক। একথা বলিয়াও আশা মিটে নাই। শেষ বলিলেন—হিন্দুবিবাহ এমন একটা জিনিষ যাহা হয় নি হবে না; হিন্দুবিবাহ এক অদ্ভুত পদার্থ। আমরা লেখকের কথাতেই হিন্দুবিবাহের সেই অদ্ভুত রহস্য ব্যক্ত করিতেছি। লেখক বলিতেছেন—"বঙ্গের স্মার্ত্তশিরোমণি রঘুনন্দনের ব্যাখ্যানুসারে আমাদের বিবাহ প্রক্রিয়ার অর্থ এই যে সপ্তপদী-গমন বৈবাহিক হোম প্রভৃতি অলৌকিক ক্রিয়ার গুণে হিন্দু স্ত্রী আহবনীয় ও যজ্ঞের কাষ্ঠের ন্যায় "অলৌকিক" পদার্থ হইয়া থাকেন। অলৌকিক শব্দের অর্থ মানবধর্ম্মাক্রান্ত নয়, মানব ধর্ম্মের অতীত যে দেবধর্ম্ম সেই দেবধর্ম্মাক্রান্ত। অতএব হিন্দুপত্নী অলৌকিক সংস্কার-সম্পন্ন অতি পবিত্র ও পূজনীয় অলৌকিক পদার্থ বলিলে সাদা কথায় এই বুঝায় যে হিন্দুপত্নী দেবতা।" হিন্দুবিবাহ শুধু আধ্যাত্মিক নহে, হিন্দু-বিবাহ মানুষকে দেবতা গড়িতে পারে। হিন্দু-বিবাহ "মন্থর মিথ্যাপদার্থ" হিন্দু নারীকে একবার স্পর্শ করিলেই তিনি অলৌকিক দেবতা হইয়া বসেন। অতএব হিন্দুবিবাহ "ঐন্দ্রজালিক"। বিষ্ণুঃ—ঐন্দ্রজালিক বলিব না; কারণ ইন্দ্রজাল যে কু অর্থেও ব্যবহৃত হয়। হিন্দুবিবাহ—অদ্ভুত, অলৌকিক। তাহা বলিয়াওতো তৃপ্তি হইল না। অভিধানে কি আরও উচ্চ কথা কিছু নাই? আছে বই কি, বল হিন্দু-বিবাহ অপৌরুষেয়। হিন্দুবিবাহ মানুষকে শুদ্ধ মুক্তি আনিয়া দেয় এমত নহে, তাহা হাতে হাতে মানুষকে দেবত্ব প্রদান করে, মানুষ অমানুষ হইয়া যায়। মানুষ দেবতা হইয়া পড়ে।

লেখক বলেন, হিন্দুনারীর পানিগ্রহণ হইবা মাত্র, তিনি দেবতা হইয়া যান। বিবাহ করিয়া হিন্দু এক দেবতাকে ঘরে আনেন। যে হিন্দুপতি স্বীয় পত্নীকে দেবতারূপে দেখেন, তাঁহার যেন একটু স্ত্রৈণতা ঘটে বোধ হয়। একে শয্যাগুরুর জ্বালায় এখনকার বাপ মা জ্বালাতন, তাহাতে আবার বউ যদি দেবতা হইয়া বসেন, তবে ত তাহাদের একেবারে মাথায় হাত। একেই এখনকার ছেলেপুলে সাহেবদের দেখাদেখি স্ত্রীকে লইয়া একঘরে হইতেছেন, বাপ মার

কাছ থেকে সরিয়া গিয়া স্ত্রীপূজা আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁহাতে আবার তাঁহারা লেখকের এই উপদেশের হাওয়া পাইলে যে স্ত্রীর চরণামৃত পান করিতে আরম্ভ করিবেন তাহা বড় বিচিত্র নহে। তাই বলি এত বাড়াবাড়ি ভাল নয়, একটু সাম্‌লে শাস্ত্রের সার গ্রহণ করা ভাল। সে যাহা হউক, এখন দেখা যাউক, শাস্ত্রে স্ত্রীকে কিরূপ দেবতা গড়িয়াছে।

প্রথমতঃ। লেখক বলেন সপ্তপদী গমন করিয়া হিন্দু পত্নী দেবতা হইয়া পড়েন। "সপ্তপদী গমন" কুশণ্ডিকার অঙ্গ মাত্র। কুশণ্ডিকা ব্রাহ্মণ জাতির বিবাহেরই অঙ্গ। ব্রাহ্মণেতর জাতিতে বিবাহকালীন সপ্তপদী গমন নাই, সুতরাং লেখকের মতেই ব্রাহ্মণেতর জাতির হিন্দুপত্নী দেবতা হইতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ। আপাততঃ লেখকের কথানুসারে স্বীকার করিয়া লও যে, ব্রাহ্মণ কন্যা বিবাহকালীন দেবতা হইয়া পড়েন। বেশ কথা। কিন্তু যে বিবাহদ্বারা হিন্দুপত্নী দেবতা, সেই বিবাহদ্বারা কি আবার হিন্দু পতী দেবতা নয়? শাস্ত্রে যখন বলিতেছে, পতিই পত্নীর দেবতা, পতি-শুশ্রূষা, পত্নীর এক মাত্র ধর্ম্ম এবং এই ধর্ম্মদ্বারা পত্নীর স্বর্গলাভ হয়, তখন কি আর বলিতে পার, যে হিন্দুবিবাহ শুদ্ধ হিন্দুপত্নীকে দেবতা গড়িয়া ক্ষান্ত হইয়াছে? হিন্দু বিবাহ লেখকের মতে যেমন স্ত্রীকে দেবতা গড়িয়াছে, তেমনি পতিকেও আবার সেই দেবতার দেবতা গড়িয়াছে। যে প্রক্রিয়ার দ্বারা হিন্দুপত্নী দেবতা হয়েন, সেই প্রক্রিয়াদ্বারা হিন্দু পতিও দেবতা হয়েন। সুতরাং শাস্ত্রার্থে পতিপত্নির মধ্যে কাহারই পদবৃদ্ধি হয় না। লেখকের মতানুসারেই বলিতে হয় আমাদের সমাজে যত স্ত্রী পুরুষ বেড়াইতেছে, সকলেই মুর্ত্তিমান দেবতা। কিন্তু শাস্ত্র ঠিক আছে। শাস্ত্র বলে হিন্দু পতিই হিন্দু নারীর দেবস্থানীয়; শুদ্ধ দেবস্থানীয় নহেন, স্থলবিশেষে তিনি দেবতা অপেক্ষাও গরীয়ান্। হিন্দু ভার্য্যার যে ব্রতে স্বামীর পাদপূজা নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহাই তাহার সর্ব্বপ্রধান ব্রত। মন্বাদিশাস্ত্রে এই রূপ পতি-পূজাই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। পুরাণ-শ্রেষ্ট মহাভারতেও সেই কথা। মহাভারত বলিতেছেন।

"পতিভক্তিই স্ত্রীলোকের প্রধান ধর্ম্ম তপস্যা ও সনাতন স্বর্গস্বরূপ। পতিই স্ত্রীলোকের পরম দেবতা, পরম বন্ধু ও পরম গতি। অবলাগণের পক্ষে পতির প্রসন্নতা স্বর্গাপেক্ষা শ্রেষ্ট"।

অনুশাসন পর্ব্ব। ১৪৬ অধ্যায়।

তৃতীয়তঃ। পুরুষ দেবতার সেবা করেন, পত্নী আবার সেই পতিকে দেবতার মত সেবা করেন, সুতরাং শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট দাম্পত্য-সম্বন্ধ লেখকের সিদ্ধান্তের বিরোধী। আমরা যে দেবতার সেবা করি, তাঁহার প্রতি আমাদের যে রূপ সমাদর, আর যাহারা আমাদের সেবা করে তাহাদের ও প্রতি কি আমাদের সেইরূপ সমাদর সম্ভবিতে পারে? অতএব পত্নীর প্রতি দেবসম্মান মানব-স্বভাব-বিরুদ্ধ। লেখকের কথা নিরর্থক ও অসম্ভব।

চতুর্থতঃ। বিবাহ দ্বারা যদি হিন্দুপতি পত্নী দেবতা হইয়া যান, তবে তাঁহাদের

আচার ব্যবহার ও চরিত্র অবশ্য দেবতুল্য হইবে। কিন্তু বাস্তবিক কি হিন্দুপতি পত্নীর চরিত্র দেবতুল্য? যদি দেবতুল্যই হইবে, তবে শাস্ত্র কাহাদিগকে নিন্দা করিয়াছে, এবং লেখক প্রস্তাবের শেষাংশে ব্রহ্মচর্য্যের যে লম্বাচৌড়া বক্তৃতা দিয়া Sermonize করিয়াছেন, তাহা কাহাদিগের জন্য? লেখক কি দেবতাদের আবার মানুষ রূপে ভাবেন না কি? লেখক যে মুখে বলিয়াছেন, হিন্দুপতি পত্নী দেবতা, সেই মুখেই কি বলিতে চান, তাঁহারা দেবতা নন? কি ভ্রান্তি! হা হিন্দুশাস্ত্র! কলিকালে অব্রাহ্মণে তোমার যে কত সূক্ষ্ম ও গূঢ় তাৎপর্য্য বাহির করিবে, তাহা কে বলিতে পারে!

হিন্দু শাস্ত্র সর্ব্বদেশীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের মত সাধ্বী স্ত্রীর গৌরব বাড়াইয়াছে বটে, কিন্তু সমগ্র স্ত্রীজাতির স্বভাব ও ধর্ম্ম-কথনছলে তাহাদিগের অত্যন্ত নিন্দা ও অবজ্ঞা করিয়াছে। এই নিন্দাবাদ ও অবজ্ঞা সম্বন্ধে লেখক বলেন, তাহা এই কতিপয় কারণবশতঃ ঘটিয়াছে।

১। তিনি অন্য একজনের কথা গ্রহণ করিয়া বলেন "এসকল সংসার-বিরাগী যোগী প্রভৃতি লোকের উক্তি। স্ত্রীলোকের রূপ মোহে ও মাধুর্য্যকুহকে অনেক সংযমীর সংযম নষ্ট হইয়া যায়"।

২। পুরুষের মধ্যে যাহারা স্বভাবতঃ দোষান্বেষী নিন্দা-প্রিয় ও তিক্তস্বভাব, তাহারা কোন জিনিষের ভাল ভাগটা দেখে না মন্দ ভাগটা দেখিয়া জিনিষটাকে একেবারেই মন্দ বলিয়া বর্ণনা করে। এবং সে রকম লোকে দুই পাঁচ জন দুষ্টা স্ত্রী দেখিয়া সমস্ত স্ত্রীজাতির যৎপরোনাস্তি নিন্দা করেন। প্রাচীন ভারতে ও সে প্রকৃতির লোক ছিল। এবং তাহারাই স্ত্রীলোকের নিন্দা করিয়া গিয়াছে। তাহাদের স্ত্রীনিন্দার উল্লেখ করিয়া হিন্দু শাস্ত্রানুসারে ও হিন্দু সমাজে স্ত্রীজাতির পদ গৌরবের পদ নয় এরূপ প্রমান করিবার চেষ্টা করা বড় একটা ন্যায্য কাজ নয়।

৩। "পুরুষ স্বভাবতঃ স্ত্রীজাতির কিছু বশ হইয়া থাকে। অতএব পুরুষকে সতর্ক করিবার জন্যও সংস্কৃত সাহিত্যে কোন কোন স্থানে স্ত্রীনিন্দা লিপিবদ্ধ হইয়া থাকিতে পারে"।

৪। অন্যান্য যে সকল সভ্যজাতি স্ত্রীজাতির সম্মান করে, তাহাদেরও সাহিত্যে স্ত্রীনিন্দা আছে। পুরাতন ইংরাজী সাহিত্যে বিস্তর স্ত্রীনিন্দা দেখা যায়। চূড়ান্ত উদাহরণ সেক্সপীয়রের "Frailty thy name is woman"

অন্যান্য সভ্য জাতির সাহিত্যে স্ত্রী নিন্দা থাকিতে পারে, যে হেতু তাহারা লেখকের মত বলে না যে আমাদের শাস্ত্রে স্ত্রীজাতির পদ গৌরবের পদ। সে যাহা হউক, প্রথম কারণ দেখাইয়া লেখক বলিতে চান, যে স্ত্রীলোকের কুহকে যোগী দিগের যোগ ভঙ্গ হইত, বলিয়া তাহারা মহা চটিয়া গিয়া স্ত্রীনিন্দা করিয়া গিয়াছেন। যাহারা যোগী ছিলেন, বনে বাস করিতেন, সংসার ধর্ম্মের ধার ধারিতেন না, তাঁহারা কি কি শাস্ত্র লিখিয়া গিয়াছেন এবং সেই শাস্ত্রের কোন্ অংশে স্ত্রীনিন্দা আছে, তাহা না দেখাইয়া দিলে লেখকের কথা প্রামাণ্য নহে। আর যদি তাঁহারা লিখিয়া গিয়াই থাকেন, সে সকল কথা কি মিথ্যা? তাঁহারা মিথ্যাপবাদ দিয়া গিয়াছেন, লেখক কি এই কথা বলিতে চান? যদি মিথ্যাপবাদ না হয়, তবে লেখক প্রতিপক্ষের কথাই সপ্রমাণ করিতেছেন, আর যদি মিথ্যাপবাদ হয়, তবে অন্যান্য শাস্ত্রকারেরাও কি মিথ্যাপবাদ দিয়া গিয়াছেন? সমগ্র শাস্ত্রের নিন্দাবাদই কি মিথ্যা কথা? ব্যাস, মনু প্রভৃতি সকল শাস্ত্রকারেরাই কি মিথ্যা নিন্দা করিয়াছেন? একথা কখনই সম্ভবিতে পারে না। সুতরাং লেখক প্রথম কারণ দর্শাইয়া বিপক্ষপক্ষই সমর্থন করিয়াছেন।

লেখকের দ্বিতীয় কারণ, তৃতীয় কারণের বিরোধী। লেখক তৃতীয় কারণে বেশ বিজ্ঞের মত অনুমান করিলেন যে, শাস্ত্রে যে নিন্দাবাদ আছে, তাহা শাস্ত্রীয় প্রশংসাবাদেরই কুফল নিবারণ করিবার জন্য লিখিত হইয়াছে। তাহা হইলেই তিনি স্বীকার করিতেছেন যে, যে শাস্ত্রে স্ত্রীলোকের আদর বাড়ান হইয়াছে, সেই শাস্ত্রেই স্ত্রীজাতির নিন্দাবাদ আছে। তবে তিনি কেন বলেন "পুরুষের মধ্যে যাহারা স্বভাবতঃ দোষান্বেষী, নিন্দাপ্রিয় ও তিক্তস্বভাব" তাহারাই স্ত্রীনিন্দা করিয়া গিয়াছে? লেখক যে মনু হইতে পত্নীর গৌরব দেখাইয়াছেন, সেই মনুই স্ত্রীজাতির নিন্দা রটনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি আবার নিজ কথা সমর্থনার্থ বলিয়া গিয়াছেন, শ্রুতি ও নিগম তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। মনু নবম অধ্যায়ে কহেন—"স্ত্রীরা সৌন্দর্য্য অন্বেষণ করে না, যুবা বা বৃদ্ধ ও দেখে না, সুরূপ বা কুরূপ হউক, পুরুষ পাইলেই উহার সহিত সম্ভোগ করে। পুরুষ দর্শনমাত্রে স্ত্রীদিগের উহার সহিত ক্রীড়া করিতে ইচ্ছা জন্মে এজন্য, এবং চিত্তের স্থিরতা নাই বলিয়া স্বভাবতঃ স্নেহ-শূন্যতা-প্রযুক্ত ভর্ত্তৃকর্ত্তৃক রক্ষিতা হইলেও ভর্ত্ত-বিরুদ্ধে ব্যভিচারপ্রভৃতি কুক্রিয়া স্ত্রীলোকে করিয়া থাকে। স্ত্রীদিগের বিধাতাকর্ত্তৃক সৃষ্ট এই রূপ স্বভাব পুরুষ বিলক্ষণ অবগত হইয়া, তাহাদিগের প্রতি অতিশয় যত্নবান্ থাকিবে। শয্যা, আসন, ভূষণ, কাম, ক্রোধ, কৌটিল্য, পরহিংসা, ঘৃণিত ব্যবহার এই সকল স্ত্রীলোক হইতে হয়, ইহা সৃষ্টিসময়ে মনু স্বয়ং কল্পিত করিয়াছেন। যে হেতু স্ত্রীলোকদিগের মন্ত্রদ্বারা জাত কর্ম্মাদি সংস্কার হয় না এজন্য উহাদিগের নির্ম্মল অন্তঃকরণ হয় না এবং বেদ স্মৃতিতে অধিকার না থাকাতে উহারা ধর্ম্মজ্ঞ হইতে পারে না এবং উহাদের মন্ত্রে অধিকার নাই এবং পাপ হইলে তাহা ক্ষালণ করিতে পারে না, এজন্য উহারা কেবল মিথ্যা পদার্থ। স্ত্রীদিগের এই রূপ স্বভাব শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে। উহাদিগের ব্যভিচারশীলতা শ্রুতি নিগমে কহিয়াছে। এবং উহাদিগের ব্যভিচারের প্রায়শ্চিত্ত উক্ত শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে।"*

* নৈতা রূপং পরীক্ষন্তে নাসাং বয়সি সংস্থিতিঃ।
সুরূপম্বা বিরূপম্বা পুমানিত্যেব ভুঞ্জতে॥
পৌংশ্চল্যাচ্চলচিত্তাচ্চ নৈস্নেহাচ্চ স্বভাবতঃ।
রক্ষিতা যত্নতোঽপীহ ভর্ত্তৃষ্বেতা বিকুর্ব্বতে॥
এবং স্বভাবং জ্ঞাত্বাসাং প্রজাপতিনিসর্গজং।
পরমং যত্নমাতিষ্ঠেৎ পুরুষো রক্ষণং প্রতি।

মনুতে এই রূপ স্ত্রীনিন্দা দেখা যায়। লেখক কি বলিতে চান "যাহারা স্বভাবতঃ দোষান্বেষী, নিন্দাপ্রিয় ও তিক্ত-স্বভাব" তাহাদের মধ্যে মনু ধর্ত্তব্য? তবে তিনি কাহার কথায় বলিতেছেন, শাস্ত্রে স্ত্রীজাতির অনেক সম্মানের কথা আছে? যে মনু স্ত্রীজাতিকে সম্মান করিতে বলিয়াছেন (এবং সেরূপ বলিবার বিশেষ কারণ আছে) সেই মনুই স্ত্রীজাতির নিন্দাপ্রচারও করিয়া ছেন। এই ত গেল লেখকের মতে প্রধান স্মৃতিকার মনুর কথা। আবার পুরাণ-শ্রেষ্ঠ মহাভারতের নিন্দাবাদ মনুর সুরেই রচিত হইয়াছে। যুধিষ্ঠির বলিতেছেন :—

"পিতামহ! ইহলোকে পুরুষেরা মোহাবিষ্ট হইয়া সতত কামিনীদিগের প্রতি এবং কামিনীগণ পুরুষদিগের প্রতি একান্ত আসক্ত হইতেছে। এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া আমার অন্তঃকরণে এই সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে যে, যখন কামিনীগণ অশেষ দোষের আকর, তখন পুরুষেরা কি নিমিত্ত উহাদিগের সহিত সংসর্গ করে? উহারা যে কোন্ পুরুষের প্রতি অনুরক্ত ও কোন্ পুরুষের প্রতি বিরক্ত হইয়া থাকে তাহা আমি বুঝিতে পারি না। উহারা ক্রীড়াকৌতুকদ্বারা পুরুষদিগকে বিমোহিত করে। উহাদিগের হস্তগত হইলে প্রায় কোন পুরুষই পরিত্রাণ লাভ করিতে পারে না। গাভী যেমন নূতন নূতন তৃণ ভক্ষণ করিতে অভিলাষ করে, তদ্রূপ উহারা নিত্য নিত্য নূতন পুরুষের সহিত সংসর্গ করিতে বাসনা করিয়া থাকে। শম্বর, নমুচি, বলি ও কুম্ভীনসি প্রভৃতি দৈত্যগণ যে যে মায়া বিস্তার করিয়া গিয়াছেন, কামিনীগণ তৎসমুদায়ই অবগত আছে। পুরুষে রোদন করিলে উহারা কপটে রোদন এবং হাস্য করিলে উহারা কপটে হাস্য করিয়া থাকে। আবশ্যক হইলে উহারা অপ্রিয় ব্যক্তিরেও প্রিয় সম্ভাষণদ্বারা গ্রহণ করে। নীতিশাস্ত্র-কর্ত্তা শুক্রাচার্য্য ও বৃহস্পতির বুদ্ধিও স্ত্রীবুদ্ধি অপেক্ষা প্রশংসনীয় নহে। কামিনীরা সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যারে সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারে। আমার বোধ হয় বৃহস্পতিপ্রভৃতি মহাত্মারা কামিনীগণের বুদ্ধির কার্য্য সমুদায় অবলোকন করিয়াই অর্থ শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। যে ব্যক্তি উহাদিগের পূজা করে, আর যে উহাদিগের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে, উহারা সেই উভয়বিধ পুরুষের প্রতি সমভাবে আসক্ত হইয়া থাকে। পিতামহ! কামিনীগণ নিতান্ত লঘুচিত্ত ও সমুদায় দোষের আকর বলিয়া জনসমাজে বিখ্যাত, তাহাদের কিরূপ স্বভাব আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক কীর্ত্তন করুন।" এই গেল যুধিষ্ঠিরের নিন্দাবাদ। ভীষ্ম আবার নিন্দাবাদ করিতেছেন শুনুন।

"ইহলোকে স্ত্রীলোক অপেক্ষা পাপশীল পদার্থ আর কিছুই নাই। প্রজ্বলিত অগ্নি, ময়দানবের মায়া, ক্ষুরধার, বিষ, সর্প ও মৃত্যু এই সমুদয়ের সহিত উহাদিগের তুলনা করা যায়। * * * স্ত্রীগণের প্রতি কোন কার্য্য বা ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট নাই। উহারা বীর্য্য বিহীন, শাস্ত্রজ্ঞানশূন্য, ও মিথ্যাবাদিনী। প্রজাপতি উহাদিগকে শয্যা, আসন, অলঙ্কার, অন্ন, পান, অনার্য্যতা কটুবাক্যপ্রয়োগ ও রতি, এই সমুদায়ে আসক্ত করিয়া দিয়াছেন। কটুবাক্যপ্রয়োগ, প্রহার, বন্ধন, অথবা বিবিধ প্রকার ক্লেশ প্রদান করিলেও উহাদিগকে পরপুরুষ-সংসর্গে নিবৃত্ত করা যায় না। মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, ব্রহ্মাও উহাদিগকে স্বধর্ম্মে রক্ষা করিতে সমর্থ হয়েন না।" ইত্যাদি।

শয্যাসনমলঙ্কারং কামং ক্রোধমনার্জ্জবং।
দ্রোহভাবং কুবাক্যঞ্চ স্ত্রীভ্যো মনুরকল্পয়ৎ॥
নাস্তি স্ত্রীণাং ক্রিয়া মন্ত্রৈরিতি ধর্ম্মো ব্যবস্থিতঃ।
নিরিন্দ্রিয়া হ্যমন্ত্রাশ্চ স্ত্রিয়োঽনৃতমিতি স্থিতিঃ॥
তথাচ শ্রুতয়ো বহ্বো নিগীতা নিগমেষ্বপি।
স্বালক্ষণ্য পরীক্ষার্থং তাসাং শৃণুত নিষ্কৃতীঃ॥
৯অ, ১৭ হইতে ১৯।

অনুশাসন পর্ব্ব। ৩৯।৪০ অধ্যায় দেখ। ভীষ্মোক্ত পঞ্চচূড়া কথিত নিন্দাবাদ পড়িলেও দেহ লোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। এ সমস্ত কি যোগিদিগের বাক্য, না স্বভাবতঃ তিক্তস্বভাব নিন্দুকের কথা? লেখক কি অন্ধ হইয়া শাস্ত্রান্বেষণ করিয়া ছিলেন? তদপেক্ষা সেক্সপিয়ারের নিন্দাবাদ কি অধিকতর তিক্ত বোধ হয়? সেক্সপিয়ারের যাহা "চূড়ান্ত" নিন্দাবাদ বলিয়া লেখক অভিহিত করিয়াছেন, তাহা কি এই সমস্ত শাস্ত্রোক্ত নিন্দাবাদের কাছে পরাজিত হয় না? এতদপেক্ষা অধিকতর নিন্দাবাদ আর কি হইতে পারে আমরা জানিনা। তবে লেখক যে অনুমান করেন, এই সকল নিন্দাবাদদ্বারা শাস্ত্র স্ত্রীদেবপূজাকারিগণকে সতর্ক করিয়া দিয়া থাকিবে, একথা সত্য। শাস্ত্র ঠিক আছে। যাহারা বাস্তবিক অতি নীচ ও হেয় পদার্থ, যখন তাহাদিগের না লইয়া সংসার ধর্ম্ম চলে না, তখন তাহাদিগের সহিত সহবাস সময়ে অতি সাবধানে চলা উচিত। পাছে সেই নীচ ও দুর্ব্বল জাতির প্রতি পুরুষ অন্যায় নিপীড়ন ও অত্যাচার করে, এজন্য শাস্ত্রে কতিপয় প্রবৃত্তি-দায়ক ও স্ত্রীজাতির আদর-সম্বর্দ্ধক বচন দিয়া গিয়াছে। তবে কেন লেখক শাস্ত্রোক্ত দুচারিটা উক্ত রূপ প্রবৃত্তি-দায়ক শ্লোক দেখিয়া একেবারে সিদ্ধান্ত করিয়া বসিলেন যে হিন্দুর কাছে স্ত্রীজাতির পদ অতি গৌরবের পদ? বিচিত্রতা এই, লেখক আবার বলিতেছেন "স্ত্রীজাতির দুই চারিটা নিন্দাবাদ দেখিয়া হিন্দুর মধ্যে স্ত্রীজাতির পদ গৌরবের পদ নয় এরূপ সিদ্ধান্ত করা কোন্ নীতি অনুসারে যে ন্যায় সঙ্গত হয়, তাহা একেবারেই বুঝিতে পারি না।" এতদুত্তরে আমরা বলিতে চাই যে, যে নীতি অনুসারে লেখক দুইচারিটা স্ত্রীজাতির সমাদরসূচক বাক্য দেখিয়া বলেন, স্ত্রীজাতির পদ হিন্দুর মধ্যে গৌরবের পদ, সেই নীতি অনুসারেই দশবিশটা নিন্দাবাদ দেখিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, হিন্দু শাস্ত্রে স্ত্রীজাতির পদ গৌরবের পদ নয়। লেখক যে এ নীতি বুঝিতে পারেন নাই কেন, তাহাই আশ্চর্য্য!

মনু স্ত্রীজাতির পক্ষে যে সমস্ত সমাদর-সূচক বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন, ব্যাস মহাভারতে তাহারই এইরূপ বিন্যাস করিয়া দেখাইয়াছেন :—

"স্ত্রীকে সর্ব্বতোভাবে আহ্লাদিত করা স্বামীর অবশ্য কর্ত্তব্য। যদি স্ত্রী পুরুষের প্রতি অনুরক্ত ও তাহার সমাগমে প্রীত না হয়, তাহা হইলে সেই অপ্রীতিনিবন্ধন সে কখনই সুসন্তান লাভে সমর্থ হয়না। অতএব

নিয়ত মহিলাগণের প্রীতি-সম্পাদন ও তাহাদিগের প্রতিপালন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যাহারা কামিনীগণের যথার্থ সৎকার করে, দেবতারা তাহাদের প্রতি প্রীতি প্রকাশ করিয়া থাকেন। আর যাহারা কামিনীগণের অনাদর করে, তাহাদের কোন কার্য্যই ফলোপধায়ক হয় না। কুলকামিনীগণ অনুতাপ করিলে কুল একেবারে বিনষ্ট হইয়া যায়। কামিনীগণ যে যে গৃহে শাপ প্রদান করে, তৎসমুদায় নিশ্চয়ই শ্রীভ্রষ্ট ও উৎসন্ন হয়। মহাত্মা মনু দেবলোকে গমন করিবার সময় পুরুষদিগের হস্তে স্ত্রীলোকদিগকে সমর্পণ করিয়া কহিয়াছিলেন, মানবগণ! স্ত্রীজাতি নিতান্ত দুর্ব্বল, ও প্রিয়কারী; উহাদিগের মধ্যে কতকগুলি নিতান্ত ঈর্ষাপরতন্ত্র, মানলাভার্থী, প্রচণ্ডস্বভাব, অবিবেচক ও অপ্রিয় কার্য্যে নিরত; অল্পমাত্র চেষ্টা করিলেই উহাদিগের ধর্ম্ম নষ্ট করা যায়; অতএব তোমরা প্রযত্ন-সহকারে উহাদিগকে রক্ষা কর। উহারা সততই সম্মান লাভের ইচ্ছা করে। অতএব উহাদিগকে সম্মান করা অতিশয় কর্ত্তব্য। স্ত্রীজাতিই ধর্ম্ম লাভের কারণ; উহারাই উপভোগাদি সমুদায়ের মূল; অতএব উহাদিগের পরিচর্য্যা ও সম্মান রক্ষা করা শ্রেয়ঃ। অপত্যোৎপাদন, অপত্য উৎপন্ন হইলে তাহার প্রতিপালন, লোকযাত্রাবিধান, স্ত্রীলোক হইতেই সমাহিত হইয়া থাকে। তাহাদিগকে সম্মান করিলে সমুদায় কার্য্য সুসিদ্ধ হয়। একদা বিদেহরাজসুহৃহিতা কহিয়াছিলেন, স্ত্রীজাতির যজ্ঞ, শ্রাদ্ধ ও উপবাস কিছুই অনুষ্ঠান করিতে হয় না, উহাদিগের স্বামী শুশ্রূষাই পরম ধর্ম্ম। উহারা সেই ধর্ম্ম প্রভাবেই স্বর্গলাভ করিতে পারে। স্ত্রীলোককে কুমারিকাবস্থায় পিতা, যৌবনাবস্থায় ভর্ত্তা ও বৃদ্ধকালে পুত্র রক্ষা করিবে; উহাদিগকে স্বাতন্ত্র্য প্রদান কদাচ বিধেয় নহে। যিনি শ্রেয়োলাভার্থী, তিনি স্ত্রীলোকদিগকে সৎকার করিবেন। উহারা লক্ষ্মীস্বরূপ, অতএব উহাদিগকে প্রতিপালন করিলে লক্ষ্মীরে প্রতিপালন ও উহাদিগকে নিগ্রহ করিলে লক্ষ্মীরে নিগ্রহ করা হয়।"

অনুশাসন ৪৬ অ।

মনুতে স্ত্রীসমাদর-সূচক যত কথা আছে, তাহার সুন্দর বিন্যাস ও ব্যাখ্যা ব্যাস দিয়াছেন। এই পর্য্যন্ত শাস্ত্রে স্তুতিবাদ দেখা যায়। কিন্তু এ স্তুতিবাদ কি প্রকাশ করিতেছে? ইহাতে এই পর্য্যন্ত প্রকাশ করে যে পুরুষজাতি স্ত্রীজাতিকে সমাদর করিবে; সমাদর করিবে কি জন্য, তাহাও স্পষ্ট প্রকাশ করা হইয়াছে। স্ত্রীজাতিকে সমাদর না করিলে সংসার ধর্ম্ম ও সমাজের উন্নতি সাধন হয় না, কারণ, তাঁহারা সমাজের অর্দ্ধ অঙ্গ।

যে যে স্বার্থসিদ্ধির জন্য স্ত্রীজাতির প্রতিপালন ও সমাদর করা উচিত, ব্যাস তাহা পদে পদে দেখাইয়া দিয়া গিয়াছেন। তিনি যেন মনুর মনের কথা খুলিয়া দিয়া গিয়াছেন। এই পর্য্যন্ত স্তুতিবাদ দেখিয়া লেখক যদি বলিতে চান যে, হিন্দু শাস্ত্রে স্ত্রীজাতির পদ বড় গৌরবের পদ, তবে তাঁহাকে নিতান্ত ভ্রান্ত বলিব। হিন্দু গোজাতিকেও পবিত্র জ্ঞানে পূজা করিয়া থাকে এবং অতি যত্নে প্রতিপালন করে। কিন্তু যে এঁড়েটা লাঙ্গল টানিতে ভাল না পারে, তাহাকেই যার

নান গোবেড়ন পিটুনি হয়, আর যে গাভী ভাল দুগ্ধ দিতে না পারে, তাহার সামান্য ঘাসের বন্দোবস্ত মাত্র।

কিন্তু লেখককে কাজেকাজেই বলিতে হইয়াছে যে হিন্দু শাস্ত্রে স্ত্রীজাতির বড় গৌরবের পদ। কারণ, তাঁহার প্রধান মতই ভ্রান্ত, সেই ভ্রান্তিকে বজায় রাখিবার জন্য তাঁহাকে নানা ভ্রান্তমতের সৃষ্টি করিতে হইয়াছে। তাঁহার প্রধান মত—হিন্দু বিবাহ আধ্যাত্মিক। এই মত কিরূপে বজায় থাকে, তজ্জন্য তাঁহাকে অনেক ওকলাতি করিতে হইয়াছে। এই দেখুন, তিনি এক ভ্রান্তি হইতে অন্য ভ্রান্তিতে কিরূপে আসিয়া পড়িয়াছেন।

"মোক্ষসাধনরূপ জীবনের সর্ব্বোচ্চ উদ্দেশ্যসাধন সম্বন্ধে স্ত্রীপুরুষের যেরূপ সম্বন্ধ দেখা গিয়াছে, তদ্দ্বারাই বুঝা যায় যে হিন্দু শাস্ত্রানুসারে স্ত্রী বড়ই আদরের, বড়ই গৌরবের সামগ্রী।" লেখক বলিতে চান যিনি মোক্ষ সাধনের সহকারিণী সেই স্ত্রী হিন্দুর নিকট অতি আদরের ও গৌরবের সামগ্রী। মোক্ষ কোথায় ও সংসারধর্ম্ম কোথায় এবং যে স্ত্রীর কোন বৈদিক মন্ত্রে অধিকার নাই, তদ্দ্বারা পতির ধর্ম্মকার্য্যে কি রূপ সহায়তা হইত, তাহা আমরা পূর্ব্বে প্রদর্শন করিয়াছি। হিন্দু বিবাহ যদি আধ্যাত্মিক না হয় এবং হিন্দু স্ত্রী যদি পতির ধর্ম্মকার্য্যের আয়োজনাদিব্যতীত আর কিছুতেই যোগ দিতে না পারিতেন, এইরূপ প্রতীত হয়, তবে অবশ্য বলিতে হইবে, হিন্দু স্ত্রীর পদ অন্য জাতীয় স্ত্রীর পদ অপেক্ষা অধিক গৌরবের সামগ্রী নহে। লেখক বোধহয় বলিতে চান হিন্দু স্ত্রী পুত্রোৎপাদন করিয়া পতিকে কামমনোচিত্তে শুশ্রূষা করিয়া এবং নিত্য নৈমিত্তিক সংসার-কার্য্যে পূজার আয়োজন ও অতিথিসৎকারাদি রন্ধনাদি সম্পন্ন করিয়া পতির মোক্ষ-পথের সহায়তা করিতেন। স্বামী রুষ্ট হইলেও হাসিয়া হাসিয়া তাহাকে সন্তুষ্ট করিতে হইত, গৃহকর্ম্মে দক্ষতা দেখাইতে হইত এবং গৃহ সামগ্রী সকল পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্ন করিয়া রাখিতে হইত।* এইরূপে পতির গৃহস্থলী কার্য্যে হিন্দু পত্নীকে গৃহ কার্য্যে সহায়তা করিয়া পতির মোক্ষ পথের সুবিধা করিয়া দিতে হইত। হিন্দু পত্নী এইরূপ কার্য্য করিয়া যদি হিন্দু পতির মুক্তির সহকারিণী হইয়া থাকেন, তবে তা সেরূপ কার্য্য, সকল জাতির ধার্ম্মিক পতির পত্নীই করিয়া থাকেন। বরং অন্য জাতিতে পত্নীর পদ আরও উচ্চ। অন্য জাতিতে পত্নী শুদ্ধ ধর্ম্মকার্য্যের সুবিধা ও আয়োজন করিয়া দেন না, পতির সহিত ধর্ম্মকার্য্যে সম্পূর্ণরূপে যোগ দিতে পারেন। অন্য জাতিতে পত্নী ধর্ম্মানুষ্ঠানে ও ধর্ম্মমন্ত্রে অনধিকারিণী নহেন, তিনি পতির সঙ্গে একাসনে বসিয়া এক মন্ত্র পাঠ করিয়া প্রকৃত পক্ষে পতির ধর্ম্মের সঙ্গিনী হয়েন। পতি শুশ্রূষাই হিন্দু পত্নীর প্রধান ধর্ম্ম, তিনি সেই শুশ্রূষাদ্বারা পতির ধর্ম্মকার্য্যে সহায়তা করেন মাত্র। তদপেক্ষা বেশী করা তাহার পক্ষে সম্ভবনীয় নহে। পত্নী কেবল সংসার ধর্ম্মেই আছেন, লেখকের মতেই সংসার-ধর্ম্মে মোক্ষ নাই, সংসার ধর্ম্মে স্বর্গমাত্র নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

"সন্ত্রীক না হইয়া ধর্ম্মচর্য্যা হয় না, হিন্দু

* মনু ৯অ,—১০০ শ্লোক।

শাস্ত্রের এই বিধানের মর্ম্ম এখন বোধ হয় কতক কতক বুঝা গেল।" কতক কতক কেন, বেশ বুঝা গেল। "সস্ত্রীক না হইয়া ধর্ম্মচর্য্যা হয় না" একথার অর্থ আমরা আরও বিশদ করিয়া দিতেছি।

আমরা দেখিতে পাই, হিন্দু শাস্ত্রে স্ত্রীজাতিকে অত্যন্ত অবজ্ঞাভাজন করিয়াছে। কেন করিয়াছে, সে কথার আলোচনা আমরা করিতে চাহি না। আমরা দেখিতে পাই হিন্দুশাস্ত্রে ব্রাহ্মণ ভার্য্যাও শূদ্রবৎ। তাহার উপনয়ন নাই, ধর্ম্মকার্য্য নাই, মন্ত্রে অধিকার নাই। তাহার আচার ব্যবহার সমুদয় শূদ্রবৎ। আমরা হিন্দু শাস্ত্রে ধর্ম্মাধিকার-কথাস্থলে স্ত্রী ও শূদ্রের উল্লেখ একত্রে দেখিতে পাই; যেন স্ত্রী জাতি ও শূদ্রের অধিকার একই প্রকার; এই দেখুন ভগবন্ অত্রি বলিতেছেন :—

অতঃপুরঃ প্রবক্ষ্যামি স্ত্রীশূদ্র পতনানি চ॥
১৩৪।

জপস্তপস্তার্থ যাত্রা প্রচটো মন্ত্রসাধনম্।
দেবতারাধনঞ্চৈব স্ত্রীশূদ্র পতনানি ষট্॥
১৩৫।

কেবল ব্রাহ্মণ পতির পূজার আয়োজন ও ভোগরন্ধনাদিমাত্র তাহার অধিকার ভুক্ত। যেহেতু, সেইরূপেই পুরোহিত জাতির ভার্য্যা পুরোহিতের শুশ্রূষা করিতে পারেন।

হিন্দুশাস্ত্র নারীজাতিকে এইরূপ হীনপদ দিয়া তাহাদিগকে কেবল পুরুষের ধর্ম্ম কার্য্যে শুশ্রূষার্থ অধিকারিণী করিয়া গেল। তাহারা পুরুষের যেমন সর্ব্বকার্য্যে সহায়তা করিবে, তদ্রূপ মন্ত্রাদিতে অনধিকারিণী হইলেও ধর্ম্মানুষ্ঠানের আয়োজনে সহায়তা করিয়া ধর্ম্মচর্য্যা করিবে। তাহাদের ধর্ম্মচর্য্যার অর্থ এই মাত্র দাঁড়ায়। সুতরাং ধর্ম্মসম্বন্ধে হিন্দুজাতির পুরুষ ও নারী সমান নহে। তাহাদের অনেক পার্থক্য। অপরাপর জাতির ধর্ম্মশাস্ত্রে এ পার্থক্য নাই। অপরাপর ধর্ম্মে কি পুরুষ কি নারী উভয়েই সমান ধর্ম্মাধিকারী। ধর্ম্মের চক্ষে স্ত্রী পুরুষ উভয়ই সমান। সুতরাং অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্রেস্ত্রী পুরুষসম্বন্ধে কোন বিশেষ বিধির প্রয়োজন হয় নাই। হিন্দু শাস্ত্রে স্ত্রীপুরুষের বিশেষ ধর্ম্ম হওয়াতে বিশেষ বিধানের প্রয়োজন হইয়াছে। হিন্দু শাস্ত্রে স্ত্রীজাতি যখন পুরুষের ন্যায় ধর্ম্মে অধিকার প্রাপ্ত হইল না, তখন সেই ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাহাদিগের অধিকারসীমা নির্দ্দেশ করা কাজেই আবশ্যক হইল। এই জন্য হিন্দু শাস্ত্রে স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে বিশেষ বিধান দেখিতে পাওয়া যায়।

আর এক কথা। আমাদের ধর্ম্মবিধানশাস্ত্র সম্পূর্ণ করিবার জন্য এক দিকে যেমন পুরুষের বিধান দেওয়া হইল, সস্ত্রীক হইয়া ধর্ম্মচর্য্যা করা উচিত, অন্য দিকেও বলা হইল। "স্বামিব্যতিরিক্ত স্ত্রীলোকের যজ্ঞ নাই, স্বামীর অনুমতি ভিন্ন ব্রত নাই, উপবাস নাই, কেবল স্বামীর সেবাদ্বারাই স্ত্রী স্বর্গ লোকে গমন করে।"

"নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথকযজ্ঞোন ব্রতং নাপ্যুপোষিতং।
পতিং শুশ্রূষতে যেন তেন স্বর্গে মহীয়তে।
মনু ৫অ—১৫৫।

লেখক সর্ব্বশেষে একটি কথা সত্য বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—"সংস্কৃত সাহিত্যের ন্যায় অকপট সাহিত্যে সকল বিষয়ের সকল দিকই আলোচিত হইয়া থাকে।" আমরা আশ্চর্য্য হইয়াছি তিনি এই সর্ব্বদিকের আলোচনা দেখিয়া কিরূপে এই পক্ষপাতী মতের-সৃষ্টি করিলেন যে হিন্দুশাস্ত্রে হিন্দুনারীর পদ অতি গৌরবের পদ? হিন্দু শাস্ত্র আলোচনা করিলে বরং উহার বিপরীত সিদ্ধান্তে আসিবারই সম্ভাবনা। কিন্তু কোন রূপ সিদ্ধান্ত না করাই ভাল। যুক্তির বিবাদ-ভূমিতে শাস্ত্রকে আনা কিছু নয়।

শ্রীঅমৃতলাল বসু।

বিদায়।

১

চলিলাম প্রাণময়ি! চলিলাম আজি,
পরাণে পাষাণ চেপে ছাড়িয়া তোমায়!
এই ভাসাইনু তরী, জানিনা বাঁচি কি মরি,
জানিনা দৈবের বশে যাইব কোথায়!
অনন্ত সলিলরাশি, গর্জ্জিতেছে অট্টহাসি,
প্রলয়-পয়োধি যেন উছলিয়া যায়!
এই ব্রহ্মপুত্র জলে, এই শূন্য বক্ষঃস্থলে
এই যে অনন্ত শূন্য ধূ ধূ দেখা যায়,
চলিলাম প্রাণময়ি! একা অসহায়!—

২

যাই যে, নাই সে খেদ, নাহি দুঃখ তায়,
ভুলিয়াও সে ভাবনা নাহি করি মনে,
কেবল রহিল দুখ, অই পূর্ণচন্দ্র মুখ,
পূরেনি আকাঙ্ক্ষা যারে নিরখি নয়নে!
এত কষ্টে এত ক্লেশে, এত যারে ভাল বেসে,
ছাড়িয়া যাহারে যাই বিধি-বিড়ম্বনে!
একটী মুহূর্ত্ত হায়, দেখিতে নারিনু তায়,
এই বিদায়ের কালে, চারু চন্দ্রাননে
ভরিল না চিত্ত, তার একটী চুম্বনে!

৩

এই দুঃখ প্রাণময়ি! রহিল অন্তরে,
অই মণিময়ী মূর্ত্তি বুকে বসাইয়া,
অন্তিম বিদায়ে হায়, ও কম-কমল পায়,
নয়নের শেষ অশ্রু উপহার দিয়া,
এই চিরদগ্ধ প্রাণ, করিব যে বলিদান
প্রেমযজ্ঞে 'স্বাহা' 'স্বাহা' মন্ত্র উচ্চারিয়া,
সে আকাঙ্ক্ষা সে বাসনা, পরিপূর্ণ হইল না,
প্রাণের আগুণ আজি প্রাণে লুকাইয়া,
যাই প্রাণময়ি! প্রাণ পাষাণে বাঁধিয়া!

৪

কোথা যাই প্রাণময়ি! ছাড়িয়া তোমায়?
তোমারে ছাড়িয়া যাই, হৃদয়ে বিশ্বাস নাই,
অথচ তরণী খানি দ্রুত ভেসে যায়!
দুর্নিবার স্রোতবলে, এই ব্রহ্মপুত্র চলে,
দেখিতে দেখিতে এই আসিনু কোথায়!
যাই তবে চন্দ্রাননে, রাখিও রাখিও মনে,
কেমনে ভুলিব তোরে হায় হায় হায়!
যাই প্রিয়ে প্রাণময়ি!—বিদায়! বিদায়!

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস।

মৃচ্ছকটিক। *

মৃচ্ছকটিক জিনিষটা কি ?

মৃচ্ছকটিক জিনিষটা কি ? ইহা বুঝাইতে হইলে প্রথমে কতকগুলি বস্তু বুঝান আবশ্যক। সেগুলি এই—

সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা কাব্য সকলকে প্রথমে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন ; শ্রব্য এবং দৃশ্য। শ্রব্য বলিতে শ্রবণ মাত্রতই যাহা সম্যক্ পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, নিজে পাঠ করিয়াই হৌক, বা অপরের পাঠ শুনিয়াই হৌক যাহার রস, ভাব, অর্থ, তাৎপর্য্য কিছুই গ্রহণ করিতে বাকী থাকেনা বর্ণিত বিষয়ের সম্পূর্ণ চিত্র হৃদয়ে প্রতিফলিত হয়, তাহার নাম শ্রব্য, যেমন রামায়ণ, রঘুবংশ ইত্যাদি। কেবল পাঠ করিয়া বা পাঠ শুনিয়া যাহার মর্ম্ম সম্পূর্ণ বুঝিতে পারা যায় না, যাহাতে বর্ণিত বিষয়ের চিত্র হৃদয়ে অঙ্কিত করিবার নিমিত্ত দৃষ্টির সাহায্য আবশ্যক করে তাহার নাম দৃশ্য। দৃশ্যের আর একটি নাম অভিনেয় অভিনয় ব্যতীত যাহার সম্যক্ মর্ম্মোদ্‌ঘাটন হয় না তাহাকে অভিনেয় বলে। অভিনয় শব্দে অবস্থার অনুকরণ।

এক্ষণে অভিনয় শব্দটীকে ভাল করে বুঝাইবার জন্য আর একটু অগ্রসর হইতে হইল। পণ্ডিতেরা বলেন সুকুমার মতি বালকদিগকে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, এই চতুর্ব্বর্গ লাভের উপায় বিষয়ে অভিজ্ঞ করাই কাব্যের উদ্দেশ্য। কাব্য অতি সুললিত ও সরস বাক্যে আমাদের হৃদয় আর্দ্র করত জগতের ভাল মন্দ এই উভয় দিকেই চক্ষুর উপর চিত্রিত করিয়া সুপথ আশ্রয় করিতে এবং কুপথ পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দেয়। কাজেই কেবল শ্রব্য কাব্যের দ্বারা সকল সময় ফল সিদ্ধির সম্ভাবনা না হওয়ায় দৃশ্য কাব্যের আবির্ভাব হইয়াছে। জগতের সকল দিক্ স্পষ্ট রূপে প্রত্যক্ষ করানই ইহার প্রধান কার্য্য। জগত বিচিত্র, ভেদ সঙ্কুল। অবস্থাভেদ, চরিত্রভেদ, ধর্ম্মভেদ, জ্ঞানভেদ, কার্য্যভেদ, রুচিভেদ শিক্ষাভেদ, অধিকারভেদ, আকারভেদ, প্রকারভেদ, কত বলিব, অনন্তভেদে পরিপূর্ণ। রাজা,প্রজা; প্রভু,ভৃত্য, ধনী,দরিদ্র; বলবান্, দুর্ব্বল ; চোর, সাধু ; পুণ্যবান্, পাপী ; সরল, খল ; উদার, বঞ্চক ; দাতা, কৃপণ ; উপকারী, অপকারী ; বিষয়ী, বিরাগী ; সংসারী, সন্ন্যাসী ; ভাগ্যবান্ অভাগা ; সুখী, দুঃখী ; দয়ালু, নিষ্ঠুর, বন্ধু, বৈরী ; অর্থী, প্রত্যর্থী, বিচারক, অভিযুক্ত ; প্রেমী অপ্রেমী ; পিতা, পুত্র ; স্বামী, স্ত্রী ; সতী, অসতী ; কুলবধূ, বেশ্যা ; সচ্চরিত্র, লম্পট ; পণ্ডিত, মূর্খ ; জ্ঞানী, অজ্ঞানী ; আস্তিক, নাস্তিক, প্রিয়ভাষী, দুর্ম্মুখ ; ক্রেতা, বিক্রেতা ; জেতা, পরাজিত ; উন্মুক্ত, বদ্ধ ; সুধীর, উন্মত্ত ; স্থির, চঞ্চল ; দক্ষ, দীর্ঘসূত্রী এই রূপ অনন্ত প্রকার লোক লইয়াই জগত। এই অনন্ত লোকের অনন্ত কার্য্য; সেই অনন্ত কার্য্যের আবার ফলও অনন্ত। এই জগতের সকল দিক স্পষ্ট রূপে প্রত্যক্ষ করাইতে হইলে এই অনন্ত প্রকার লোকের স্বরূপ কার্য্য ও কার্য্যানুসারে ফললাভ এই কয়টি জীবন্ত রূপে প্রত্যক্ষ করাইতে হয়। রাজাকে প্রত্যক্ষ করাইতে হইলে রাজভোগানুগত—শারীরিক—সুশ্রীকতা, পরিচ্ছদ, পরিবার, অঙ্গন্যাস, বাক্যন্যাস, প্রভাব, গাম্ভীর্য্য ইত্যাদি যাহা রাজার থাকা আবশ্যক তা সকলেই ঠিক ঠিক দেখাইতে হইবে, এইরূপ ধনী, দরিদ্র, প্রভু, ভৃত্য যখন যাহাকে দেখাইবে তখন তাহাকে সেই রূপে অবিকলই দেখাইতে হইবে, এই অবিকল দেখানর নামই অভিনয়। পণ্ডিতেরা মোটামুটি অভিনয়কে চার প্রকারে নির্দ্দেশ করিয়াছেন; শারীরিক, মানসিক,বাচিক এবং আহার্য্য অর্থাৎ বৈশিক। যে কাব্য এই চার প্রকার অভিনয় দ্বারা জগতের স্বরূপ প্রত্যক্ষ করাইয়া সৎ ও অসৎ বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করে তাহার নামই দৃশ্যকাব্য।

দৃশ্য কাব্যের আর একটি নাম রূপক, রূপক শব্দের অর্থ যাহা এক ব্যক্তিকে অন্যস্বরূপে দেখায়, নটকে রাজা, প্রজা, প্রভু, ভৃত্য ইত্যাদি রূপে দেখায়। নায়ক বিশেষে রস বিশেষে, বিষয়বিশেষে, রচনার রীতি-বিশেষে আবার দৃশ্য কাব্যের বিশেষ বিশেষ সংজ্ঞা লক্ষিত হয়। যথা নাটক, প্রকরণ ভাণ, ব্যায়োগ, সমবকার ডিম, ইহামৃগ, অঙ্ক, বীথি, প্রহসন, নাটিকা, ত্রোটক' গোষ্ঠী, সট্টক, নাট্যরাসক, প্রস্থান, উল্লাপ্য, কাব্য, প্রেক্ষণ, রাসক, সংলাপক, শ্রীগদিত, শিল্পক, বিলাসিকা, দুর্ম্মল্লিকা, প্রকরণী, হল্লীশ, এবং ভাণিকা। এই আটাইশটির মধ্যে প্রথম দশটি রূপক এবং অবশিষ্ট আঠারটি উপরূপক নামে প্রসিদ্ধ। এই রূপক ও উপরূপক ভেদের প্রতি কোন বিশেষ কারণ নির্দ্দেশ করা হয় নাই। তবে বোধ হয় যে অগ্রে প্রথমে দশটি মাত্র আবিষ্কৃত হওয়ায় উহারাই রূপক নামে প্রচলিত হয়। তাহার পর পরবর্ত্তী আচার্য্যগণ যাহা আবিষ্কৃত করেন তাহাদিগকে উপরূপক নামে অভিহিত করা হয়।

এক্ষণে বলি মৃচ্ছকটিক জিনিষটা কি ? মৃচ্ছকটিক একখানি দৃশ্য কাব্য প্রকরণ, নাটক নয়। নাটক নয় প্রকরণ বাঙ্গালী পাঠক দিগের পক্ষে অথবা কেবল বাঙ্গালী পাঠক কেন ইংরাজী নবিশ দিগের পক্ষেও একটা গোলের কথা বটে; কারণ বাঙ্গালায় কুলীন কুলসর্ব্বস্বও নাটক, নীলদর্পণও নাটক সীলাবতীও নাটক বিধমঙ্গলও নাটক, ইংরাজীতেও ঐরূপ টেম্পেষ্টও নাটক, হামলেট ও

* বিগত এই মাঘ বুধবার শ্রীশ্রী৺ পঞ্চমীর দিবস সারস্বত মহোৎসব উপলক্ষে ভট্টপল্লীস্থ সংস্কৃত ব্যবসায়ী ছাত্রগণ মৃচ্ছকটিক নাম প্রসিদ্ধ সংস্কৃত প্রকরণের অভিনয় করিয়া রঙ্গস্থ দর্শক বৃন্দের পরম তৃপ্তি উৎপাদন করে। প্রস্তাব লেখকও সেই সময় সেইক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়া অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়া। সেই উৎসাহের বিকাশমাত্র কতকগুলি প্রবন্ধাকারে বিভায় প্রকাশিত করিবার সঙ্কল্প।

নাটক, ম্যাকবেথও নাটক, কেটোও নাটক, মারচেণ্ট অব বিনিসও নাটক। ফলকথা ইংরাজ প্রসাদাৎ বঙ্গে বর্ত্তমান রঙ্গ ভূমির আবির্ভাব। ইংরাজীতে যেমন নাটক ও প্রহসন ভিন্ন আর কথা নাই বাঙ্গালাতেও তাই ঘটিয়াছে প্রহসন ছাড়া যা কিছু সবই নাটক। কিন্তু সংস্কৃতের নাটক একটি ভিন্ন পদার্থ, কেবল পদার্থ ভিন্ন নয়, ইহাতে একটু বিশেষ মহত্ব ও গৌরবও আছে রামা, শ্যামা, যার ইচ্ছা তার কথা লইয়া নাটক হয় না। নাটকের বাঁধাবাঁধি নিয়ম আছে, সে নিয়মগুলি এই—

১। যার খুশি তার গল্প লইয়া নাটক রচনা হইবে না। কোন পুরাণ বা ইতিহাস মূলক ইতিবৃত্ত অবলম্বন করিয়া নাটক রচনা করিতে হইবে।

২। নাটকের নায়ক রামা শ্যামা যে ইচ্ছা সে হইতে পারিবে না। প্রখ্যাত বংশীয় ধীরোদাত্ত লক্ষণান্বিত গুণবান্ রাজর্ষি, কোন স্বর্গীয় পুরুষ বা তাঁহার অবতার এতদ্ভিন্ন আর কাহাকে নাটকের নায়ক করা যাইতে পারিবে না।

৩। নাটকে শৃঙ্গার বা বীর এই দুই এর মধ্যে একটি মাত্র রস প্রধান থাকিবে। অন্য রস অপ্রধান থাকিবে কিন্তু নানাবিধ রস থাকা আবশ্যক।

৪। নাটকে পাঁচের কম এবং দশের অধিক অঙ্ক করিতে পারা যাইবে না। ইহাতে সুখ দুঃখের উদ্দীপক ঘটনা সকল বর্ণিত হইবে।

এই কয়টি নিয়মই নাটকের নাটকত্ব সম্পাদক এইগুলি সর্ব্বতোভাবে প্রতিপালন করিয়া নাটক রচনা করিতে হইবে। এবং কোন দৃশ্য কাব্য নাটক কি না? ইহা বিচার করিতে হইলে এই গুলি ধরিয়া বিচার করিতে হইবে।

মৃচ্ছকটিক নাটক নয়, কারণ ইহার নায়ক চারুদত্ত বাণিজ্য ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ বংশীয়। ইহার ইতিবৃত্তও কোন পুরাণ বা ইতিহাস মূলক নহে। কাযেই ইহাতে নাটকের লক্ষণ যাইতেছে না ইহা নাটক নয়, তবে কি? প্রকরণ, কেন না প্রকরণ কবি-কল্পিতলৌকিক বৃত্তকে আশ্রয় করিয়া রচিত হয়। ইহাতে এক মাত্র শৃঙ্গার রসেরই প্রধান্য থাকে, ধীর প্রশান্ত লক্ষণান্বিত ব্রাহ্মণ অমাত্য অথবা বণিক্ এইতিনের অন্যতম ইহার নায়ক হওয়া চাই। নায়কের ধর্ম্ম ও অর্থের অবনতিও ইচ্ছার ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে। নায়িকা কুলজাই হৌক বেশ্যাই হৌক অথবা উভয়ই হইতে পারে। ইহাতে ধূর্ত্তর, জুয়াচোর বিট ও চেটের চরিত্র বিশেষ রূপে বর্ণিত হইয়া থাকে। এক্ষণে দেখ মৃচ্ছকটিকের গল্প, কবিকল্পিত লোক রহস্য মাত্র, নায়ক বাণিয্য ব্যবসায়ী, ব্রাহ্মণ, ধীর প্রশান্তলক্ষণান্বিত চারুদত্ত। ইহাতে শৃঙ্গার রসেরই প্রাধান্য। নায়িকা চারুদত্তের পূর্ব্ব বিবাহিত স্ত্রী কুলজা ধূতা দেবী এবং নবাগুরক্ত গণিকা বসন্তসেনা। আর ইহাতে ধূর্ত্ত শকার, দ্যূতকর মাথুর প্রভৃতি, বিট ও চেট প্রভৃতির চরিত্র ও বিশেষ রূপে বর্ণিত হইয়াছে। এই জন্যই বলিতেছি মৃচ্ছকটিক প্রকরণ।

শ্রীঅষীকেশ শাস্ত্রী।

লক্ষ্ণৌ ও ইহার ভগ্নাবশেষ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

আসাফুদ্দৌলা মৃত্যুশয্যায় স্বপুত্র উজীর আলিকে উত্তরাধিকারী নির্দ্দেশ করিয়া যান। উজীর আলি তাঁহার প্রধান বেগমের পুত্র ছিলেন না। এজন্য তাঁহার মৃত্যুর পর রাজ্যে মহাগোলযোগ উঠিল। তথাপি উজীর আলিই সিংহাসন প্রাপ্ত হইলেন। ইংরাজ কোম্পানিও প্রথমত ইহাতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু পরে তাঁহাদের রাজ্যলিপ্সা বলবতী হইয়া উঠিল। অর্থ-লোভ ন্যায়পরায়ণতার মূলে কুঠারাঘাত করিতে সঙ্কুচিত হইলনা। গভর্ণর জেনারেল সার জন শোর স্বয়ং লক্ষ্ণৌয়ে উপস্থিত হইয়া উজীর আলিকে পদচ্যুত করিলেন ও সাদত আলির সিংহাসনের পথ পরিষ্কার করিয়া দিলেন।

সাদত আলি আসাফুদ্দৌলার বৈমত্রেয় ভ্রাতা। ইনিই উজীর আলির সিংহাসনারোহণের পথে প্রধান কণ্টক স্বরূপ ছিলেন। বারাণসি ইহার আদিম বাসস্থান। সাদত আলি সার জন শোরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে বুঝাইয়া দেন যে যদি কোম্পানির সাহায্যে তিনি অযোধ্যার নবাব উজীর পদে প্রতিষ্ঠিত হন তাহাহইলে ইংরাজের লাভ ভিন্ন ক্ষতিহইবেনা। লাভের মায়ায় মুগ্ধ হইয়া গভর্ণর জেনারেল অবশেষে ইহাঁরই সহিত সন্ধি বদ্ধ হইতে প্রতিশ্রুত হইলেন। সাদত আলির মন্ত্রণাবলে আসাফুদ্দৌলার উজীর আলির সহিত ঘনিষ্ট রক্তসম্বন্ধ সন্দেহজনক প্রমাণ হইল। এবং উজীর আলি চিরদিনের জন্য অযোধ্যার রাজমুকুট হারাইলেন।

নবাবদিগের সহিত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ক্রমান্বয়ে যে সকল সন্ধি স্থাপিত হয় তাহাতে চুণার বারাণসী, গাজীপুর ও কানপুর অযোধ্যা রাজ্যচ্যুত হয়। এতদ্ভিন্ন ঐ রাজ্য যে বৃটিশ সৈন্য রক্ষিত হইতে থাকে তাহার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ নবাবসরকার হইতে প্রতি বৎসর ৫৫ লক্ষ টাকা নির্দ্ধারিত ছিল। এক্ষণে সাদত আলির সহিত নূতন সন্ধিতে ঐ টাকা ৭৬ লক্ষে পরিণত হইল ও এলাহাবাদ নগর কোম্পানির স্বায়ত্বে আসিল।

সাদত আলি ১৭৯৮ খৃঃ অব্দে নবাব উজীর পদে অভিষিক্ত হন। ইনি অযোধ্যার সর্ব্বাপেক্ষা বিজ্ঞ, ধার্ম্মিক ও সুবিচারক নরপতি বলিয়া খ্যাত। কথিত আছে ইনি যৌবনের প্রারম্ভে অতিশয় লম্পট ও অসদাচারি ছিলেন। একদা কোন দরবার গমন করিয়া ইহাঁর আচার ব্যবহার হঠাৎ পরিবর্ত্তিত হয়। পরে সাদত আলি এরূপ মিতব্যয়ী হইয়াছিলেন যে অনেকে আসাফুদ্দৌলার সহিত তুলনা করিয়া তাঁহাকে কৃপণ বলিয়া ঘৃণা করিত। তাঁহার পূর্ব্বাপি-

কারী যেরূপ লক্ষ্ণৌয়ের পশ্চিম দিক নির্ম্মাণ করিয়া যান ইনি উহার পূর্ব্বাদিক সেইরূপ নির্ম্মাণ করেন। কেশরবাগ ও দিলখুসার মধ্যবর্ত্তী অট্টালিকা গুলি প্রায় সমস্তই ইহার নির্ম্মিত। তন্মধ্যে প্রধান কয়েকটি নিম্নে বর্ণিত হইল।

দিলখুসা উপবনবাটী লামার্টিনিয়রের প্রায় অর্দ্ধ মাইল পূর্ব্বে উচ্চ ভূমির উপর স্থাপিত। সাদত আলি সময়ে সময়ে এই স্থানে শীকারার্থ আসিতেন; ও তন্নিবন্ধন তাঁহার আদেশে সন্নিহিত জঙ্গলে বহুসংখ্যক মৃগ আবদ্ধ থাকিত। বেগমগণ ও কখন কখন আগ্রহ পূর্ব্বক দিলখুসায় আসিয়া বাস করিতেন। সিপাহি যুদ্ধের সময় প্রধান সেনাপতি স্যার কোলিন ক্যাম্বেল লক্ষ্ণৌ উদ্ধারার্থ আসিয়া সর্ব্ব প্রথমে এই অট্টালিকা অধিকার করেন; ও কিছুদিনের জন্য এই স্থানেই তাঁহার সেনা সন্নিবেশিত হয়।

দিলখুসা অতিক্রম করিয়া পশ্চিমমুখে গমন করিলে এই নবাবের নির্ম্মিত হিয়াৎ বক্স কুঠী কঙ্করওয়ালি কুঠী নুরবক্স কুঠী, বাদসামঞ্জিল, চিনিবাজার, ও টেড়িকুঠী ক্রমান্বয়ে দৃষ্ট হয়। ইহাদের এরূপ বিশেষ শিল্প পারিপাট্য নাই যে এখন ও দর্শনীয় বলিয়া গণ্য হয়; কিন্তু তথাপি ঘটনা ক্রমে ইহাদের নাম চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছে। সিপাহিযুদ্ধের ইতিহাসে ইহাদের প্রত্যেকের নাম রক্তাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে।

হিয়াৎবক্স কুঠী নবাব দিগের শাসন কালে চিকিৎসালয় ছিল। পরে ইহা চিফ কমিশনরের আবাসস্থান হয়। এই স্থলেই ইংরাজ কুল কলঙ্ক নরহন্তা মেজর হডসন বিদ্রোহি দিগের হস্তে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন। দিল্লী অধিকার কালে এই মহাত্মাই দিল্লীশ্বরের নিরস্ত্র পুত্রদিগকে স্বহস্তে গুলি করিয়া পৌরুষ দেখাইয়া ছিলেন। পার্থিব বিচারে দোষ মুক্ত হইয়াও নৃশংস ইংরাজ তদপেক্ষা মহত্তর বিচারে অবশেষে অব্যাহতি পাইল না। বেগম কুঠীতে অসীম সাহসে যুদ্ধ করিয়া অনেক বিদ্রোহী সিপাহী প্রাণ ত্যাগ করে। টেড়ি কুঠীতে সাদত আলির রাজকার্য্য সম্পন্ন হইত। অবশিষ্ট কুঠীগুলি প্রায় তাঁহার পুত্রদের বাস বাটী ছিল।

গোমতীর তীরে মতিমহল নামে তিনটি স্বতন্ত্র অট্টালিকা এখনও দেখা যায়। পশ্চিমস্থ যেটি লোহিত বর্ণে রঞ্জিত সেইটিই প্রকৃত মতিমহল। পূর্ব্বে ইহার শিখরদেশে মুক্তার আকার সদৃশ একটি গম্বুজ ছিল ও তদনুসারে অট্টালিকার নামকরণ হয়। বাটীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে পর্য্যটক দেখিতে পাইবেন ভিতরের ছাদে কাষ্ঠের সুন্দর কারুকার্য্য এখনও অটুট অবস্থায় রহিয়াছে। মতিমহলের অবশিষ্ট অংশ সাদত আলির পুত্রের নির্ম্মিত।

মতিমহলের কিয়দ্দূর পশ্চিমে নদীতটে ফরহদ বক্স (অর্থাৎ আনন্দ দায়ক) প্রাসাদ সাদত আলির রাজত্ব কাল হইতে কেশর বাগ নির্ম্মাণ পর্য্যন্ত ইহাই লক্ষ্ণৌয়ের রাজ প্রাসাদ ছিল। জেনারেল মার্টিন ইহার নদীতীরস্থ অংশ প্রস্তুত করিয়া নবাবের নিকট বিক্রয় করেন। উহার অবশিষ্ট ভাগ ও প্রসিদ্ধ সিংহাসন কক্ষ (থগরুল সুলতান) সাদত আলির নির্ম্মিত। সিংহাসনগৃহের

অপর নাম 'লাল বার দোয়ারি।' নবাবদিগের শাসন সময়ে এইস্থলে দরবার বসিত। প্রত্যেক রাজার রাজ্যাভিষেকের সময় বৃটিশ রেসিডেন্ট তাঁহাকে লইয়া প্রথমে এই কক্ষে উপবেশন করাইতেন ও উপঢৌকন প্রদান করিতেন।

সিপাহিযুদ্ধের পর ভারতবর্ষের যে সকল স্থান ইংরাজের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়াছে তন্মধ্যে লক্ষ্ণৌয়ের 'রেসিডেন্সি' একটি প্রধান। যখন উত্তর পশ্চিম প্রদেশে শ্বেতকায় আবাল বৃদ্ধবনিতার শোণিতে বিদ্রোহের প্রচণ্ড স্রোত বহিতেছিল, যখন আকবরের বংশধর আবার 'জগদীশ্বরো বা' নামে দিল্লীর সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন, যখন দুর্দান্ত নানার বিশ্বাসঘাতকতায় জেনারেল হুয়িলরের সৈন্য দল একে একে জাহ্নবীর অতলতলে শায়িত হইল তৎকালে কেবল এই রেসিডেন্সিতে অদ্ভুত বীর্য্য বলে ও অপরিসীম সাহসিকতা প্রভাবে ইংরাজ স্বকীয় গৌরব কথঞ্চিৎ রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়া ছিলেন।

আসাফুদ্দৌলার রাজত্বকালে রাজপ্রাসাদ দৌলত খানার এক ভাগেই বৃটিশ রেসিডেন্টের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল। পরে সাদত আলি ফরহদ বক্স প্রাসাদে গমন করিয়া নিকটেই রেসিডেন্সি স্থাপনের নিমিত্ত উক্ত অট্টালিকা নির্ম্মাণ করেন। পূর্ব্বে সৈন্যাদি এস্থানে কিছুই থাকিত না। কর্ণেল বেলি রেসিডেন্ট পদ প্রাপ্ত হইলে সাদত আলি তাঁহার সম্মানার্থে এক দল সৈন্য এই স্থানে সন্নিবেশিত করেন; ও তাহাদের জন্য রেসিডেন্সির দ্বারদেশে একটি বাসস্থান নির্ম্মিত হয়। এই কারণ বশত রেসিডেন্সির দ্বার ও তদন্তর্গত ভূমি এবং বাটী সমূহ 'বেলিগার্ড' নামে খ্যাত ছিল। এই নামেই সিপাহিযুদ্ধের পর জগদ্বিখ্যাত হইয়াছে।

যেস্থান অদ্যাপি বেলিগার্ড নামে পরিচিত তথায় এক্ষণে পূর্ব্বস্থিত অট্টালিকাগুলির চিহ্নমাত্র ও নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কোথাও বা একখণ্ড ভগ্ন দেয়াল এক সুপ্রশস্ত দ্বিতল অট্টালিকার পরিবর্ত্তে দণ্ডায়মান আছে। কোথাও বা কয়েকখানি শৈবালাচ্ছন্ন পুরাতন ইষ্টক কোন মনোরম বাঙ্গালার কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে। কোথাও বা তৃণাচ্ছন্ন ভূমির উপর একটি ক্ষুদ্র ইষ্টক নির্ম্মিত নূতন স্তম্ভ ভূতপূর্ব্ব ডাকঘরের স্থান নির্দেশের জন্য স্থাপিত হইয়াছে। যে কয়েকটি অদ্যাপিও গৃহের আকার ধারণ করিয়া আছে তাহাদের ও অবস্থা অতীব শোচনীয়। তন্মধ্যে রেসিডেন্সি, বেগমকুঠি, নাচঘর, ডাক্তার ফেরারের বাটী, প্রকৃত বেলিগার্ড কুঠী, ইত্যাদি কয়েকটি প্রধান। দেয়ালগুলি জর্জ্জরিত অবস্থায় বিদ্রোহী দিগের অসংখ্য গোলা গুলির চিহ্ন এখনও ধারণ করিতেছে। এরূপ সুচারু রূপে ভগ্নাবশেষ রক্ষিত হইয়াছে যে হঠাৎ দেখিলে বোধ হয় যেন দুই চারি দিন পূর্ব্বে এই অট্টালিকাগুলির উপর গোলা গুলির স্রোত বহিয়া গিয়াছে। যেখানে কামানের অগ্নিময় গোলা প্রাচীর ভেদ করিয়াছিল সেখানে এক একটি প্রশস্ত গহ্বর হইয়াছে; ও অগণ্য বন্দুকের গুলির আঘাত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র সমূহে পরিণত হইয়াছে। জনৈক বঙ্গীয় কবি বেলিগার্ড দর্শন করিয়া গাহিয়াছিলেনঃ—

"ভগ্ন অট্টালিকা গুলি, শোচনীয় ধ্বজা তুলি'
দাঁড়াইয়ে শ্রীহীন দশায় ;
কা'রো গেছে ছাদ পড়ি, খসিয়াছে কা'রো কড়ি
হেলিয়ে র'য়েছে চির, কা'রো কায়।
প্রাচীর হ'য়েছে চির, কাহারো ভেঙেছে শির,
আঁখি নীর ঝরে হেরি' তা'য় ;
কারুকর-কৃত কারু দেখিলাম নাহি কা'রু,
সবি কাল গ্রাসিয়াছে, হায় !"

গৃহগুলির অভ্যন্তরের দশা অধিকতর শোচনীয়। সর্ব্বধ্বংসী সময় এখনও কোন কোন স্থানের শোণিত চিহ্ন নষ্ট করিতে সমর্থ হয় নাই। অবরোধকালে যাহার যেখানে বাসস্থান ছিল, প্রধান প্রধান সেনাপতি যথায় হত হইয়াছেন সে সমস্তই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্বেতমর্ম্মরে স্থানে স্থানে লিখিত রহিয়াছে। রেসিডেন্সির যে কক্ষে কর্ণেল পামরের রূপগুণযুতা উনবিংশবর্ষীয়া কন্যা গুলির আঘাতে সংসার ত্যাগ করিয়াছিলেন, পর্য্যটক সেই স্থানে তাঁহার নাম প্রস্তরে খোদিত দেখিতে পাইবেন। যিনি সিপাহি-সমরে বৃটিশ বীরগণের অগ্রগণ্য ছিলেন, যাঁহার দয়া ও মহানুভবতা সেই ভীষণ দুর্দ্দিনেও প্রকাশিত হইয়াছিল, যিনি বিদ্রোহী নরহন্তা বন্দীগণের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞাপত্র স্বাক্ষর করিতেও দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতেন সেই মহামান্য সেনাপতি সার হেনরি লরেন্সের মৃত্যুস্থান ডাক্তার ফেরারের গৃহে এখনও নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। যাঁহারা শ্বেতকায়দিগের রক্ষার্থে বেলিগার্ডের দ্বারদেশে অবাধে স্ব স্ব প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন সেই সকল হিন্দু সেনাপতিগণের নামও বৃহৎ একটি শ্বেত প্রস্তরে খোদিত আছে। তাঁহাদের স্মরণার্থ বহির্ভাগে একটি স্তম্ভও লর্ড নর্থব্রুকের শাসন সময়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। রেসিডেন্সি কুটীর উচ্চ স্তম্ভের ভগ্নাবশেষ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। উপরে যেস্থান হইতে মচ্ছিভবন ও আলম বাগে সঙ্কেত গমনাগমন করিত সেখানে একখণ্ড কাষ্ঠ প্রোথিত হইয়াছে। নীচে সুবিখ্যাত, 'তয় খানা' অর্থাৎ মৃত্তিকার অভ্যন্তরে ঘর। ইহারা প্রায় পূর্ব্ব অবস্থাতেই বর্ত্তমান। কক্ষগুলি অতি সুপ্রশস্ত ও উচ্চ। উর্দ্ধে আলোক প্রবেশের অনেকগুলি কাচে রক্ষিত সুন্দর পথও পূর্ব্বে ছিল। এই সকল গৃহে গ্রীষ্মের প্রচণ্ড উত্তাপে পীড়িত হইয়া শীত প্রধান দেশীয় ইউরোপীয়গণ সচরাচর আশ্রয় লইতেন। বিষম বিপ্লবের সময় রুগ্ন ইংরাজ রমণী, ও শিশু সন্তান ইহাদের অভ্যন্তরেই রক্ষা পাইয়াছিলেন।

রেসিডেন্সি বাটীর সংলগ্ন পুষ্প বৃক্ষাদি শোভিত মৃণ্ময় স্তূপের উপর সর হেন্‌রি লরেন্সের কবর। দুই চারিপদ অতিক্রম করিলেই ভূতপূর্ব্ব নাচঘর এখানে শ্বেতমর্ম্মরের একটি ভগ্ন কৃত্রিম প্রস্রবণ এখনও দৃষ্ট হয়। সিপাহি যুদ্ধের সময় নাচঘর চিকিৎসালয়ে পরিণত হইয়াছিল।

সিপাহি যুদ্ধের এই সুপ্রসিদ্ধ রঙ্গভূমি বর্ণন করিতে হইলে একখানি বৃহৎ গ্রন্থ লিখিতে হয়। আমাদের স্থান সংকীর্ণ। যুদ্ধের পূর্ব্বে যে কয়েকটি প্রধান অট্টালিকা বেলিগার্ডের অন্তবর্ত্তী ছিল, নিম্নে কেবল তাহাদের নাম নির্দ্দেশ করিয়াই আমরা ক্ষান্ত থাকিব;—

রেসিডেন্সি, নাচঘর, বেলিগার্ড ফটক,

সওয়ার্সকুঠী, সেগোরবাটি, অর্ম্মসন্,* এণ্ডারসন, ডুপ্রাট, মার্টিনিয়র,† ডাকঘর, চিকিৎসালয়, ডাক্তার ফেরারের বাটী, বেগমকুঠী, শিখ-স্কোয়ার, গ্রান্ট, গবিন্‌স্, ওমানি, ইনেস, রিডান, পশু রাখিবার গৃহ, জবাই গৃহ, গির্জ্জা ও বৃগেড্ মেস‡।

বেলিগার্ডের পার্শ্বেই কবর স্থান। এস্থানটি সুরম্য উদ্যানে পরিবৃত। কবরসমূহের উপর খোদিত লেখাগুলি পাঠ করিলে পাষাণ হৃদয়ও দ্রব হয়। এই স্থানেই জেনারেল নীল, মেজর ব্যাংকস ও আর আর অনেক উক্ত সাময়িক প্রসিদ্ধ যোদ্ধা চির নিদ্রায় শায়িত আছেন।

১৮১৪ খৃ অব্দে সাদত আলি খাঁর মৃত্যু হয়। পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে তাঁহার বৃটিশ কোম্পানির সহিত সন্ধিতে অযোধ্যা রাজ্য কিরূপ ক্ষতি গ্রস্ত হয়। তথাপি ইহাতে ও সাদত আলি নিস্তার পান নাই। মারকুইস্ অব ওয়েলেস্‌লির শাসন সময়ে আরও দুইদল বৃটিস সৈন্য লক্ষ্ণৌয়ে প্রেরিত হয়, ও তাহাদের ব্যয় নির্ব্বাহার্থে সাদত আলি স্বরাজ্যের অর্দ্ধাংশের ও অধিক কোম্পানির হস্তে সমর্পণ করিতে বাধ্য হন। তিনি

* বাটীগুলি যে যে সেনাপতি কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়াছিল ও উহাদিগের কোন স্বতন্ত্র নাম না থাকায় তাহাদের পরিবর্ত্তে সৈন্যাধ্যক্ষদিগের নামই নির্দ্দেশ করা গেল।

† এই স্থানে মার্টিনিয়র বিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকগণ আশ্রয় লইয়াছিল।

‡ সিপাহিযুদ্ধের ইতিহাসজ্ঞ অনেকেরেই স্মরণ থাকিতে পারে যে লক্ষ্ণৌ উদ্ধারকালে এই বাটীতে এক অদ্ভুত ঘটনা হইয়াছিল। যে রাত্রে সারকলিন ক্যাম্বেল অবরুদ্ধ ইংরাজদিগকে রেসিডেন্সি ত্যাগ করিয়া দিলখুসার আশ্রয় লইতে আদেশ দিলেন সেই রজনীতে কাপ্তেন ওয়াটারম্যান নামক জনৈক সেনাপতি এই অট্টালিকার কোন নিভৃত কক্ষে নিদ্রায় অভিভূত ছিলেন। যখন সকলে গমনার্থ প্রস্তুত হইল তখন ভুল ক্রমে তাঁহার নাম মাত্রও উল্লিখিত হইল না। রাত্রি দুই ঘটিকার সময় নিদ্রাভঙ্গ হইলে তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইল যে তিনি একাকী পঞ্চাশৎ সহস্র শত্রুতে বেষ্টিত আছেন। অতঃপর দ্বিরুক্তি না করিয়া তিনি ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িলেন ; ও লামর্টিনিয়রের নিকট স্বজাতিগণ সহ মিলিত হইলেন।

এইরূপ আর একটি ঘটনা মচ্ছিভবন দুর্গ অবরোধের সময় ঘটিয়াছিল। লক্ষ্ণৌয়ে বিদ্রোহাগ্নি প্রজ্বলিত হইবার পূর্ব্বে সার হেনরি লরেন্স এই দুর্গ ও রেসিডেন্সি উভয় স্থানেই রক্ষা করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। কিন্তু পরে যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ায় এই স্থানে বিপদের আশঙ্কা করিয়া, মচ্ছিভবন পরিত্যাগ করিয়া ও রেসিডেন্সিতে আশ্রয় গ্রহণ করিতে আজ্ঞা দেন। আসিবার সময় উক্ত দুর্গ ভূমিসাৎ করিয়া দিতে বলেন। তদনুসারে বৃটিশ সৈন্য নিরূপিত সময়ে রজনীতে মচ্ছিভবন হইতে নির্গত হইয়া বারুদ ও অগ্নি সহকারে দুর্গ ভস্মসাৎ করিয়া দেয়। তৎকালে কেবল মাত্র একজন ইংরাজ সৈনিক মদ্যপান করিয়া অজ্ঞানবস্থায় দুর্গের কোন কক্ষে পতিত ছিল। বারুদের তেজে গৃহগুলি যেরূপ চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া আকাশে উঠিল, সেও তদ্রূপ উর্দ্ধে উঠিয়া ক্ষণমধ্যে ভূমে প্রক্ষিপ্ত হইল। তথাপি তাহার ঘোরতর নিদ্রার কিঞ্চিৎমাত্র ব্যতিক্রম ঘটিল না। প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গ হইলে সে সাশ্চর্য্যনেত্রে দেখিল উর্দ্ধে গৃহের কড়িকাষ্ঠের পরিবর্ত্তে আকাশ এবং নীচে শয্যার পরিবর্ত্তে ইষ্টকরাশি। পরে সমস্ত ব্যাপার বোধগম্য হইলে সে গাত্রোত্থান করিয়া অক্ষত শরীরে রেসিডেন্সিতে পৌঁছিল, ও তাহাকে তদবস্থ দেখিয়া তাহার ভ্রাতৃবর্গ মধ্যে কৌতুক রব পড়িয়া গেল।

পর লোক গত হইলে রাজ্য শাসন ভার তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র গাজিউদ্দিন হায়দরের উপর ন্যস্ত হইল। ইনিও কয়েকবার কোম্পানিকে অর্থ দ্বারা সাহায্য করেন। নেপাল যুদ্ধের সময় লক্ষ্ণৌয়ের কোষাগার হইতে প্রায় দুই কোটি টাকা প্রদত্ত হয়। ১৮২২খৃ অব্দে গাজিউদ্দিন হইতে ইণ্ডিয়া কোম্পানির নিকট হইতে পুরুষানুক্রমে 'রাজা' উপাধি প্রাপ্ত হন। সেই অবধি নবাব উজীর নাম লুপ্ত হয়।

গাজিউদ্দিন 'নজফ আশারাফ' নামে স্বকীয় কবরপ্রস্তুত করেন। ইহাকে সচরাচর 'না নজফ' বলে। 'নজফ নামক' পর্ব্বতে মুসলমান ধর্ম্ম প্রচারক মহম্মদের জামাতা আলির কবর আছে। উহার অনুকরণে গাজিউদ্দীনের কবর নির্ম্মিত হয়, এবং সেই জন্যই ইহার ঐরূপ নাম হইয়াছে। শা নজফের গঠন সাধারণ মসজিদের ন্যায় নহে। উচ্চ সিংহদ্বার পথে প্রবেশ করিয়া পর্য্যটক দেখিতে পাইবেন যে মসজিদের সম্মুখে বা পার্শ্বে দ্বার নাই। প্রবেশ পথ পশ্চাতে উর্দ্ধে গোলখিলানের উপর এক অত্যুচ্চ গম্বুজ ছাদ স্বরূপ রহিয়াছে। ভূমিতল শ্বেত ও কৃষ্ণ মর্ম্মরে আচ্ছাদিত। মধ্য স্থলে নবাবের কবর। গাজিউদ্দীন বংশ পরম্পরায় এইস্থানের গৌরব রাখিবার জন্য অনেক সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছিলেন। তজ্জন্য এখনও এখানে অনেক গৃহ সজ্জা দেখিতে পাওয়া যায়। দেয়ালে লক্ষ্ণৌয়ের বিখ্যাত শিল্পকরদিগের অঙ্কিত নবাবগণের অনেক গুলি সুন্দর চিত্র আছে। লক্ষ্ণৌ উদ্ধার কালে এইস্থানে বিদ্রোহিদিগের সহিত সার কোলিন ক্যাম্বেলের ঘোরতর যুদ্ধ হয়।

শা নজফের নিকটেই গাজিউদ্দীনের নির্ম্মিত 'কদম রসুল' মসজিদ। কোন ফকীর আরব দেশ হইতে মহম্মদের পদচিহ্ন অঙ্কিত একখণ্ড প্রস্তর আনয়ন করেন। তাহা অতি যত্ন সহকারে এই স্থলে রক্ষিত হয়। বিদ্রোহকালে এই প্রস্তর এস্থান হইতে অপসৃত হইয়াছিল। কে লইয়া যায় তাহার কিছুই সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

মতিমহলের অন্তর্বর্ত্তী 'মোবারক মঞ্জিল' ও শা মঞ্জিল গাজিউদ্দীনের আজ্ঞায় প্রস্তুত হয়। শেষোক্তটী বন্য হিংস্র জন্তুদিগের যুদ্ধ ভূমি ছিল। কিন্তু নবাবেরা বিপদ আশঙ্কা করিয়া হস্তী গণ্ডার প্রভৃতি বৃহৎ শ্বাপদের যুদ্ধ এস্থানে হইতে দিতেন না। গোমতীর পরপারে উহার রঙ্গভূমি নির্দ্দিষ্ট ছিল। নবাব অমাত্যবর্গে বেষ্টিত হইয়া শা মঞ্জিলের বারেণ্ডা হইতে ঐ যুদ্ধ অবলোকন করিতেন।

কেসরবাগ ও চিনিবাজারের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে ও আধুনিক ক্যানিং কলেজের সমীপে দুইটী মসজিদাকার বৃহৎ অট্টালিকা এখনও বর্ত্তমান আছে। গাজিউদ্দীন এত ভৃত্য কবর নির্ম্মাণ করাইয়া স্বজাতি মধ্যে অসাধারণ পিতৃ মাতৃ ভক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন। প্রথমটী তাঁহার পিতা সাদত আলির ও দ্বিতীয়টী তাঁহার মাতা মুরশিদ জাদির কবর। যে স্থানে এক্ষণে সাদত আলি শায়িত আছেন তাঁহার জীবদ্দশায় সেস্থানে তাঁহার পুত্র গাজিউদ্দীনের আবাস বাটী ছিল। কথিত আছে, গাজিউদ্দীন

পিতৃ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া মনস্থ করেন যে তিনি যেরূপ তাঁহার পিতার বাসস্থান অধিকার করিলেন সেরূপ তাঁহার পিতারও তাঁহার ভূত পূর্ব্ব স্থান অধিকার করা কর্ত্তব্য। এবং তদনুসারে স্বকীয় পুরাতন আলয় ভগ্ন করিয়া তৎস্থানে তাঁহার পিতার কবর নির্ম্মাণ করিতে আজ্ঞা দেন।

গোমতীর উপর এক্ষণে যে লৌহসেতু দৃষ্ট হয় তাহা গাজিউদ্দীনের আজ্ঞায় ইংলণ্ড হইতে আনীত কিন্তু উহা স্থাপন করিতে অনেক বিলম্ব হইয়াছিল। মহম্মদ আলি শার সময় উহার নির্ম্মাণ সম্পন্ন হয়।

১৮২৯ খৃ অব্দে গাজিউদ্দীনের মৃত্যু হইলে নসিরুদ্দীন হায়দর পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনি অতিশয় ব্যসনাসক্ত ও বিলাসপ্রিয় ছিলেন। প্রবাদ এইরূপ যে ইনি বৎসরে ছয়মাস রাজকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন ও অপর ছয়মাস কেবল অন্তঃপুর মধ্যে বাস করিতেন। "ছত্রমঞ্জিল" ইহাঁর প্রধান কীর্ত্তি। বেগমদিগের নিমিত্ত এই অপূর্ব্ব অট্টালিকা নির্ম্মিত হয়। লক্ষ্ণৌয়ের হর্ম্ম্যরাজির মধ্যে ইহাই সর্ব্বোচ্চ। গম্বুজের উপর যে সুবৃহৎ পিত্তলের ছত্র দেখা যায় পূর্ব্বে উহা এরূপ ছিল না। উহার পরিবর্ত্তে সুবর্ণছত্র শোভা পাইত। শুনা যায় বৃটিশ গভর্মেণ্টের আজ্ঞানুসারে এরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। উক্ত ছত্রের নিমিত্তই প্রাসাদের নাম ছত্রমঞ্জিল দেওয়া হইয়াছিল এক্ষণে এ বাটীতে অনেকগুলি গভর্মেণ্ট কার্য্যালয় আছে; ও ইহার নদীতীরস্থ অংশে ইংরাজদিগের নানাবিধ সমিতির অধিবেশন হইয়া থাকে।

নসিরুদ্দীন হায়দর 'আরাওয়ালী কুঠি' অর্থাৎ জ্যোতিষ আলোচনা স্থান স্থাপন করেন। কর্ণেল উইলকক্স নামে জনৈক পাশ্চাত্য জ্যোতির্ব্বেত্তার উপর ইহার নির্ম্মাণভার অর্পিত হইয়াছিল। ১৮৪৭ খৃঃ অব্দে ওয়াজিদ আলি শার রাজত্বকালে উক্ত ইংরাজের মৃত্যু হইলে ইহার কার্য্য স্থগিত হয়। তথাপি ইহার বহুমূল্য যন্ত্রাদি সযত্নে রক্ষিত হইয়াছিল। কিন্তু সিপাহিযুদ্ধের পর তাহাদের আর কোন চিহ্ন পাওয়া গেল না। (অযোধ্যার বিদ্রোহে বিখ্যাত নেতা ফয়জাবাদবাসী আমেদ উল্লা শা ও তাহার অনুচরবর্গ এইস্থানে বাস করিত।)

বিলাতি রাগ নামক উদ্যান নসিরুদ্দীনের আজ্ঞায় স্থাপিত হয়। ইহাতে নানাবিধ ইউরোপীয় বৃক্ষ রোপিত হইয়াছিল। বেগমগণ এখানে সর্ব্বদা ভ্রমণ করিতে আসিতেন। ওয়াজিদ আলির আজ্ঞায় এই উদ্যান উচ্চ প্রাচীরে বেষ্টিত হয়।

লক্ষ্ণৌয়ে এখন যে পরিখার ভগ্নাবশেষ আছে, গঙ্গা হইতে জল আনয়ন উদ্দেশে উহা এই সময়েই খ্যাত হইয়াছিল; কিন্তু নসিরুদ্দীন ইহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

ক্রমশঃ

শ্রীরাজেন্দ্রচন্দ্র গোস্বামী।

মুসলমানী বাঙ্গালা।

(শুজ্জু উজাল বিবীর কেচ্ছা)

বাঙ্গালা হিন্দু মুসলমানের দেশ। মুসলমানের সংখ্যা হিন্দুর প্রায় অর্দ্ধেক। বাঙ্গালার লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের শাসনাধীন দেশে যত মুসলমান আছে সমস্ত তুর্কের সাম্রাজ্যে তত আছে কিনা সন্দেহ। কিন্তু দুঃখের মধ্যে হিন্দুরা মুসলমানদিগের বড় একটা খবর রাখেন না। এইসকল মুসলমানেরা কিন্তু বাঙ্গালী। বাঙ্গালার উপর হিন্দুদিগের যত টান, মুসলমানদিগের তদপেক্ষা কোন ও মতেই কম নহে। অনেক মুসলমানলেখক বাঙ্গালা ভাষায় উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট পুস্তক লিখিয়াছেন। মুসলমানেরা দুই তিন খানি বাঙ্গালা সংবাদ পত্র চালাইয়া থাকেন। তাহার বাঙ্গালা অন্যান্য বাঙ্গালা সংবাদ পত্রের বাঙ্গালা হইতে বিশেষ বিভিন্ন নহে। মীর মশারফ হোসেন "বিষাদ সিন্ধু" নামক যে পুস্তক খানি রচনা করিয়াছেন তাহা বাঙ্গালার একখানি মহারত্ন। উহার মোহরম পর্ব্ব ও উদ্ধার পর্ব্ব পাঠ করিলে মহম্মদের পরবর্ত্তী মুসলমানগণের ইতিহাস আচার,ব্যবহার,শাসন প্রণালী ইত্যাদি সুন্দর রূপে জানিতে পারা যায় ও মুসলমানেরা সেই সময়ে নব ধর্ম্মের উত্তেজনায় পড়িয়া যেরূপ উদ্দীপনা লাভ করিয়াছিলেন তাহারও কিয়দংশ পাঠকগণের মনে সংক্রামিত হয়। মীর মশারফ হোসেনের বসন্তকুমারী নাটকও উৎকৃষ্ট বাঙ্গালায় লিখিত!

যে সকল মুসলমান লেখক এই সকল বাঙ্গালা গ্রন্থ বা বাঙ্গালা সংবাদ পত্র রচনা করেন তাঁহারা প্রায়ই সুশিক্ষিত লোক। কিন্তু অশিক্ষিত মুসলমানেরাও বাঙ্গালা ভাষায় বহুতর পুস্তক লিখিয়া থাকেন তাঁহাদের পুস্তক যে ভাষায় লিখিত হইয়া থাকে তাহাকে মুসলমানী বাঙ্গালা কহে। মুসলমানী বাঙ্গালাকে একটী স্বতন্ত্র ভাষা বলিতে পারা যায় না। উহা বাঙ্গালা ভাষার একটী অবান্তর ভাগ মাত্র। মুসলমান লেখক যে জেলায় বাস করেন সেই জেলার অনেক প্রচলিত কথা তাঁহার গ্রন্থে স্থান প্রাপ্ত হয়। আর তাহার সঙ্গে সঙ্গে অনেক উর্দ্দু আরবীও পারসী মিশ্রিত হইয়া থাকে।

আমরা পূর্ব্ব বাঙ্গালা হইতে অনেক গুলি মুসলমানী বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়া থাকি। শ্রীহট্টের পুস্তকগুলি 'কাট নাগরী' নামক অক্ষরে লিখিত। শিয়ালদহ হাজিপাড়ায় কাট নাগরীর একটী প্রেস আছে। প্রতি বৎসর সেই প্রেস হইতে অনেকগুলি পুস্তক প্রচারিত হয়। সাধারণতঃ মুসলমানী বাঙ্গালা পুস্তক, বাঙ্গালা পুস্তক যেখানে শেষ হয়, সেই খান হইতে আরম্ভ হয়। কিন্তু দুই একখানি পুস্তক বাঙ্গালা পুস্তকের ন্যায় আরম্ভ হইতেও দেখিয়াছি। উর্দ্দু ও পারসী যেরূপ প্রতি ছত্র ডাইনদিক হইতে আরম্ভ করিয়া বাম দিকে যায়; মুসলমানী বাঙ্গালার সেরূপ নহে। মুসলমানী বাঙ্গালার ছত্রগুলি বামদিক হইতে ডাইন দিকে যায়। কেবল কেতাব খানি আমরা যাহাকে শেষ দিক বলি সেই দিক হইতে আরম্ভ হয়। মুসলমানী বাঙ্গালা গ্রন্থ অধিকাংশ কলিকাতা টাকা ও কুমিল্লা হইতে প্রকাশিত হয়। ময়মনসিংহ জেলারও কোন কোন স্থানে মুসলমানী বাঙ্গালার ছাপা খানা আছে।

মুসলমানী বাঙ্গালায় বিদ্যালয় পাঠ্য পুস্তক নাই। মুসলমানদিগের আইন ও ধর্ম্মের পুস্তকের সংখ্যাও অতি অল্প। এই ভাষায় যত পুস্তক বাহির হয় তাহার অধিকাংশই গল্পের বহি এবং পয়ারাদি নানা ছন্দোবন্ধে লিখিত। এই সকল গল্পের বহি বা কেচ্ছার কেতাবে যেমন বাঙ্গালা ওপারসী শব্দ প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয় সেইরূপ হিন্দুদের দেবীর সঙ্গে মুসলমান পীর ফকীরের কথাও একত্রে লিখিত হইয়া থাকে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ, হাসেন হোসেন আলি একত্রে জড়িত হইয়া এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করে। এই ভাষায় একখানি পুস্তকের নাম শুজ্জু উজাল বিবীর কেচ্ছা এই পুস্তকের গোড়ার কয়েক পংক্তি তুলিয়া দিতেছি।

"আল্লা আল্লা বল ভাই যত মমিনগণ
শুজ্জু উজাল বিবির কিছু শুনা দিয়া মন।
শুজ্জু উজাল বিবি যদি সুজ্জু পানে চায়
দেখিয়া আছমানের শুজ্জ সেই লজ্জা পায়
সুজ্জ উজাল বিবিএর ছাই অঙ্গলাল
আছমানের চন্দ্র দেখে হয় ময়লাহাল।"

গল্পটী অতি সুন্দর। মহম্মদের জামাতা আলি মহম্মদের কন্যা ফতে মা বিবির এন্তেকালের পর হনুফা বিবি নামক আর একটী কন্যা বিবাহ করেন হনুফা বিবির পুত্রের নাম হানিফা। হানিফার পাঁচ বিবাহ।

পহেলা করেছে সাদি মল্লিকা আকার
তারপরে করে সাদি জৈগুন সুন্দর
সোমর ওভানে করে সাদি জোরে পাইল
ওয়াল
তারপরে করে সাদি বিবি সোণাভান
পবন কুমারী বিয়া করে আপনার জোরে
এই পঞ্চ বিবি দেবহানিফার ঘরে।

একদিন হানিফা পাঁচ বিবির সঙ্গে বসিয়া হাস্য পরিহাস করিতেছেন এমন সময়ে হাহুফা বিবি বলিলেন আজি আমার ঘরে তোমাদের খানা খাইতে হইবে। সকলে খানা খাইতে বসিয়াছেন, হানিফা বিবিদের রূপ দেখিয়া এমন মোহিত হইয়াছেন, যে তাঁহার হাতের গ্রাস পাতে পড়িয়া গেল মুখে আর উঠিল না। ইহা দেখিয়া সাদোয়ান (খানার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা) আল্লার নিকটে গিয়া ফরিয়াদ করিল যে—

ফরিয়াদ আমার এই শুন পাক সাই
হুকুম কর আমি আজ দুনিয়া ছেড়ে যাই
যাইয়া যে নিজপুরি রহি ছাপাইয়া
মরুক হানিফা তবে মোরে না চিনিয়া
আমাকে ভুলিয়া দেখে নারির ছরত
আমি বিনে ছরাত রহে কেয়াছা ভাত।
আল্লা বলে সাদোয়ান থাকহ সংসারে
সবার কেছমকে থাক মার হানিফারে।
এত যদি কহিলেন আপনি নিরঞ্জন
জৈগুন বিবী জানিল গায়েবে।

জৈগুন বিবী আল্লাদরবারের কথা জানিতে পারিয়া কাণে কাণে সোণাভানকে এই কথা বলিতেছেন এমন সময় হানিফা বলিলেন তোমরা কি বলাবলি করিতেছ; তখন জৈগুন বলিলেন যে তুমি আমাদের রূপ দেখিয়া মোহিত হইয়াছ কিন্তু আমাদের অপেক্ষাও সুন্দরী এক বিবি আছে—

এমনি ছুরত তাহে দিল বারিতালা
চন্দ্র কে জিনিয়া তার ছুরত উজ্জালা

শুনিয়াই হানিফা সেই বিবির জন্য উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন কিছুতেই তাঁহার নিবৃত্তি হইল না। তিনি সেই রমণীর অন্বেষণে যাইতে উদ্যত হইলেন। বিবীগণ কান্দিয়া বলিতে লাগিল

কলেমা পড়িনু মোরা জাত মজাইয়া
আকবত পাব বলি ভরসা করিয়া
তাহাতে করিলে তুমি সবারে নৈরাশ
আর না যাইব মোরা মা বাপের পাস

কিন্তু হানিফার কিছুতেই তৃপ্তি নাই, হানিফা আহার ত্যাগ করিল। হানুফা একদিন খানা পাকাইয়া সামনে ধরিলেন কিন্তু সাদোয়ান ফুল হইয়া উড়িয়া গেল সকলে কান্দিয়া আকুল হইল। হানিফা বলিলেন,

হানিফা বলেন আমি দানা নাহি পাব
আল্লার নামেতে তবে ফকীর হইব
তছবি হাতে নিল মর্দ্দ ত্যজিছিল ছেবে
ফকির হইল মর্দ্দ আল্লার রাহা পরে।

তখন হানিফা বারকোটে গিয়া শুর্জ্জ উজ্জাল বিবীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেন। আট দিন অনাহারে নিরন্তর ভ্রমণে একান্ত ক্লান্ত হইয়া হানিফা নদীতীরস্থ এক বৃক্ষতলে উপবেশন করতঃ আল্লার নাম লইতে আরম্ভ করিলেন। আশা বৃক্ষ নদী গর্ভে পতিত হইয়া তাহার জীবলীলা সাঙ্গ করিবেন। জিবরিল তখন অত্যন্ত কাতর হইয়া আল্লার নিকট হানিফার দুর্দ্দশার কথা বর্ণন করিলেন, তখন

আল্লা বলে জিবরিল শুন দিল দিয়া
ঘোড়াখেতুর পাখী আছে আন বোলাইয়া
হানিফার দোসর হউক যাইয়া নিকটে
পাইবে খাইতে খানা গেলে বারকোটে।

স্মরণমাত্র ঘোড়া খেতুর উপস্থিত হইল। আল্লাতালা তাঁহাকে হানিফার পথ প্রদর্শক হইয়া বারকোটে লইয়া যাইতে বলিলেন। আজ্ঞামাত্র ঘোড়াখেতুর হানিফার নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে বারকোটে লইয়া যাইবার কথা বলিল। বারকোটের নাম শুনিয়াই হানিফা জিজ্ঞাসা করিলেন কোন্ বারকোট? যেখানে শুর্জ্জুউজ্জাল বিবি আছেন? ঘোড়াখেতুর বলিল হাঁ। তাহা শুনিয়া হানিফা হৃষ্টচিত্তে পক্ষীর অনুসরণ করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর গিয়া হানিফা ঘোড়াখেতুরকে বলিলেন ভাই তুমি একটু ডালের উপর বইস। আমি নমাজ পড়িয়া লই। হানিফার নমাজের এক অংশ উদ্ধৃত হইল।

এলাহি আলয়ামীন আল্লা গোন কর মাপ।
আর না সহিতে পারি সাদোয়ানের তাপ॥
মাপকর আল্লা তালা আমার তকছির।
থোড়া খানা দিলাও আল্লা আমার খাতির॥

তখন খোদা হানিফার কাতরতায় কাতর হইয়া জিবরিলকে স্মরণ করিলেন এবং বলিলেন জিবরিল তুমি হানিফাকে মেবামত পুরে লইয়া যাও। যেখানে আজি মেহমানি (যজ্ঞ) হইতেছে। তথায় উহাকে খানা খাওয়াও। জিবরিল ফকিরের বেশধারণ করিয়া হানিফার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া মেহমানিতে উপস্থিত হইলেন। তথায় অনেক ফকীর উপস্থিত ছিলেন জিবরিল তাঁহাকে বিছানার উপর বসাইয়া রাখিয়া প্রস্থান করিলেন। যথা সময়ে খাদিমগণ (পরিবেশন কারীগণ) খানা লইয়া আসিল হানিফ বলিলেন তোমাদের কল্যাণে আজি আমি ছয়মাসের পর খানা খাইলাম বলিয়া আহার করিতে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু খোদার নাম লইলেন না অমনি খোদার আজ্ঞায় সমস্ত অন্ন উড়িয়া গেল। অমনি সমবেত ফকীরগণ বলিয়া উঠিল এই দুষ্ট ফকীর ভূতের সাহায্যে আমাদের অন্ন উড়াইয়া দিয়াছে। বলিয়া হানিফকে বাঁধিয়া মারিতে উদ্যত হইল। তখন হানিফ আপন পরিচয় দিলেন যে রূপে সাদোওয়ানের ফরীয়াদে তাঁহার অন্নবন্ধ হইয়াছে তাহাও বিবৃত করিলেন। তখন সকলে মিলিয়া তাহাকে দুধ ও অন্যান্য খাবার আনিবার জন্য চেষ্টা করিলেন কিন্তু তাহা হইল না। সমস্ত খাদ্য দ্রব্য উড়িয়া গেল। হানিফ কাঁদিয়া ঘোড়া খেতুরের নিকট উপস্থিত হইলেন। এবং উভয়ে বারকোটে গেলেন। তথায় শুর্জ্জ উজ্জাল বিবী যে মসজিদে নেমাজ পড়েন সেই মসজিদে গিয়া বসিয়া রহিলেন। বিবি নেমাজ করিয়া হানিফাকে জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কে? হানিফা আপন পরিচয় দিল। বিবী বলিলেন তুমি যে নবীর খান্দান তাহার পরিচয় কিসে পাইব? আমি তোমায় কতকগুলি সওয়াল করি তুমি তাহার জবাব দাও; বলিয়া কতকগুলি প্রশ্ন করিলেন। প্রশ্ন শুনিয়া হানিফা পরদিন প্রত্যূষে জবাব দিবেন স্বীকার করিলেন। কিন্তু তাঁহার আত্মপুরুষ শুষ্ক হইল; তখন ঘোড়াখেতুর আসিয়া বলিল হানিফ তুমি বড় বিপদগ্রস্ত হইয়াছ। এই সকল প্রশ্নের জবাব দেওয়া তোমার কর্ম্ম নয়। তুমি এক কর্ম্ম কর এক গাছা পালক দিয়া যাইতেছি তাই লইয়া থাক শুর্জ্জ উজ্জাল সকালে আসিয়া তুমি জবাব দিতে না পারিলে, আওয়াজে তোমায় ভস্মরাশি করিয়া ফেলিবে। তুমি যদি এই পালক সম্মুখে ধর, তোমার কিছুই হইবে না। আমি আল্লার নিকট তোমার জন্য দরবার করিতে যাই। বলিয়া ঘোড়াখেতুর আল্লার দরবারে গমন করিল এবং বলিল সাদোয়ান বিহনে হানিফার বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ পাইয়াছে তাহাকে হানিফের নিকট না পাঠাইলে বিপদ উদ্ধার হয় না। আল্লা তখন সাদোয়ানকে কহিলেন আর অভিমান করিয়া থাকিলে চলিবে না, তুমি যাও হানিফের নিকট আবির্ভাব হও। সাদোয়ান অগত্যা তাঁহার মুখে উঠিল। হানিফার ধড়ে বুদ্ধি আসিল।

পরদিন যখন শুর্জ্জু উজ্জাল উপস্থিত হইলেন এবং মনোমত জবাব না পাইলেন তখন ঘোরতর আওয়াজ করিলেন। পালকের বলে হানিফার কিছুই হইল না।

এ দিকে জৈগুন সেই আওয়াজ শুনিতে পাইলেনএবং স্বামীর বিপদ জানিতে পারিয়া শাশুড়ী হানিফা বিবিকে বলিলেন। হানিফা কাঁদিয়া গিয়া মক্কায় ফতেমা বিবি তাঁহার সপত্নীর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে বারকোটে যাইতে বলিলেন।

ফতেমা রাজী হইলেন এবং আলির অনুমতি অনুসারে বারকোট যাত্রা করিলেন।

অতএব ফতেমাজান বারকোটে দেশে।
শুরুজ করিল বন্ধ আপন বাতাসে॥
শুরুজের জেত বন্ধ করিলেন আপনি।
ঠাণ্ডা হাওয়া ছাড়িলেন পবন তাহা জানি
সাসেকের পথ মাতা আইল তিলেকে।
তবে নিজ মূর্ত্তি মাতা হন আপনাকে॥

যখন জগন্মাতা ফতেমা বারেকাটে উপস্থিত হইলেন তখন শুর্জ্জু উজ্জালের আর সন্দেহ রহিল না তিনি হানিফাকে নবীর খানদান জানিয়া, তাহার সঙ্গে বিবাহ

করিলেন হানিফা তাঁহাকে কলমা পড়াইয়া ধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন এবং গুর্জ্জু উজাল আপনার সমস্ত ধনসম্পদ পাড়াপড়সীকে বিলাইয়া দিয়া শ্বশুর বাড়ী গেলেন।

মুসলমানী বাঙ্গালার একটী কেচ্ছা পাঠক বর্গকে উপহার দিয়া অদ্যকার মত বিদায় হইলাম।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

পুস্তক।

পুস্তক পরম্পরায় এক চিরন্তন মনের বিকাশ হইতেছে। যে কোন পুস্তক লিখিত হয়, উহা এই বিশ্ব মনের চিন্তা শৃঙ্খলের একটি অংশ ; বিশ্ব-মনের মহাতীর্থ-প্রয়াণের একটি অভিমুখীন পাদ। যে চিন্তা-বীজ আদৌ উপ্ত হইয়াছিল তাহাই নিরবচ্ছেদ বিকাশ পাইয়া আসিতেছে। বিপুল-চ্ছায়াসমন্বিত বনস্পতি বীজের রূপান্তর। নিগূঢ়তত্ত্বাবিষ্কারিণী পরমার্থবিজ্ঞনের বাণী কৌপীন-মাত্র-পরিধান মৃগয়াজীবীর মেঘ ও তড়িম্মালা দর্শনে অস্ফুট ধ্বনির রূপান্তর মাত্র। জগতের শৈশব ও বার্দ্ধক্য সমসূত্রপাতে বর্ত্তমান। সৃজনাবধি কত অগণ্য মানব এই সংসারে আসিয়াছে,—চলিয়া গিয়াছে ; শৈশব ও বার্দ্ধক্যের সহিত তাহাদের মনেরও শৈশব ও বার্দ্ধক্য হইয়াছে। এই ব্যক্তিগত বালত্ব ও বৃদ্ধত্বের ভিতর দিয়া সমষ্টীভূত মানব জাতির সমন্ধ-বিধায়ি একটী চিরন্তন মন ও শৈশবাদি বিবিধ অবস্থার ভিতর দিয়া চলিয়াছে। এই মনের বিকাশের ক্রমশই অধিকতর স্ফুটতা হইতেছে ; কিন্তু ইহার বালত্ব ও বৃদ্ধত্ব নিরূপণের উপায় নাই। কারণ এ স্থলে সমষ্টির সহিত এক দেশের তুলনা হইতে পারে না। সসীমত্ব অনন্তত্বের পরিমাপক হইতে পারে না।

এইরূপে আমরা দেখিতেছি যে আমরা শুদ্ধ মানবজাতির পারম্পর্য্য রক্ষা করিতেছি না ; পরন্তু মানবমনের চিন্তা শৃঙ্খলেরও পারম্পর্য্য রক্ষা করিতেছি। মৃতজন জীবিতজনে সঞ্জীবিত। এই মহাচিন্তার ক্রমাভ্যুদয় পরীক্ষা করিলে আমরা দেখিতে পাইব যে ইহার সম্বন্ধে মৃত্যু নাই ; ব্যক্তিগত অস্থিতি ইহার স্থিতির লোপ করিতে পারে না। অক্ষত অনারত ভাবে এই স্রোতঃ বহিয়াছে। দূরতম প্রদেশে বন জঙ্গলের ভিতর কোন শৈল শৃঙ্গ হইতে উৎপন্ন হইয়া একটী কৃশ সলিল রেখা হইতে ক্রমশঃ বর্দ্ধমান হইয়া ইহা এখন বিপুল স্রোতস্বতী হইয়াছে। অক্ষুণ্ণভাবে মহোদধির অভিমুখে চলিয়াছে। ইহার বেগ ব্যাহিত হইবার নয় ; গতি সংরোধক মহামহীরুহ সকল ছিন্ন, ভগ্ন ও বিপর্য্যস্ত করিয়া সাগর সঙ্গমোদ্দেশে চলিয়াছে।

আমাদের তমসাচ্ছন্নজীবনে কি অপূর্ব্ব আলোক-প্রবাহ ; দুর্ব্বহ দুঃখ সন্দেহ ভারে কি মহতী সান্ত্বনা। যখন আমাদের মন সন্দেহে আকুলিত হয় ; যখন বিশ্বসংসার অবগুণ্ঠিত পিশাচ সন্ধ্যের রঙ্গভূমিবৎ বোধ হয়, যখন তরুলতা তুর্কসুলতানের মূক ঘাতকভৃত্যের ন্যায় নির্মম নির্দয়ভাবে আমাদের দুঃখের সন্দেহের সাক্ষী হইয়া নীরবভাবে দাঁড়াইয়া থাকে তখন আমাদের এই এক মহতী সুখবার্ত্তা, জীবিতানুবন্ধিনী সান্ত্বনা, যে আমরা স্বভাবের প্রথম অথবা একমাত্র সন্তান নহি। আমাদের অগ্রে

অনেক লোক আসিয়াছে আমাদের পশ্চাৎ অনেক লোক আসিবে। নির্জ্জন মরুতে আমি একমাত্র জীব নহি। অনেক লোকের সহিত আমার সম-দুঃখ-সুখতা। আমার সমক্ষে আজ যে ঘোরপ্রশ্ন, যে ভীষণ সন্দেহ, সেই ঘোর প্রশ্ন, সেই ভীষণ সন্দেহ অনেক পূর্ব্বতন লোকদিগের হৃদয় আক্রমণ করিয়াছে, মস্তিষ্ক সঞ্চালন করিয়াছে। যদি আমাদিগের প্রত্যেককে স্বকীয় প্রতিভা ও আয়াসবলে প্রতি প্রশ্নের উত্তর করিতে হইত, আমাদিগের জ্ঞান আমাদিগের সৃজন করিতে হইত, তাহা হইলে ক্ষুদ্র মনুষ্য কত ক্ষুদ্র থাকিত, পশু ও মানবের জ্ঞানমূলক পার্থক্য কোথায় বিলোপ পাইত। মানুষ সৃষ্টির প্রধান,—মানুষ দেবত্বের প্রতিমায় গঠিত। কেন? কবর ও চিতানলে মানবের জ্ঞান বিলুপ্ত বা ভস্মীভূত হয় না বলিয়া কাহারও উপার্জ্জিত জ্ঞান নষ্ট হইবার নহে। একের জ্ঞানে অপরাপর সকলেই জ্ঞানবান্। যাহা একজন অনেক আয়াসে লাভ করিল তাহাতে তাহার বিশ্বময় জ্ঞাতিমণ্ডলী অংশীদার। এইরূপ জ্ঞানের সাধারণ-তন্ত্র জ্ঞানের উপচয়সাধন করিতেছে। এই জন্যই আমাদের পূর্ব্বপুরুষ ঋষিরা বাণীকে দেবতা করিয়াছেন, শব্দকে ব্রহ্ম বলিয়াছেন।

অতএব দেখুন, আমরা কি বিপুল ঐশ্বর্য্যের উত্তরাধিকারী। কত শত দেশে, কত শত বার, কত শত ব্যবস্থাপক কত শত দায়বিধি সংস্থাপন করিয়া সমাজ স্থিতি-রক্ষায় চেষ্টিত হইয়াছেন। কিন্তু ইহা অপেক্ষা আমরা কি গুরুতর দায়ের, মহত্তর বিভবের অধিকারী। মানব জাতির জ্ঞান-ভাণ্ডার উহার প্রধান অধিকার। এখানে দেশকাল ভেদ নাই ; কি যাজ্ঞবল্ক্য, কি পরাশর, কি সক্রেটিস, কি প্লেটো যিনি যে জ্ঞানরত্ন সমাহরণ করিয়াছেন তাহা সকলই আমাদের। এখানে গোত্রভেদ নাই, পুরুষ ভেদ নাই, বয়োভেদ নাই একটী নির্ব্বিরোধ ভ্রাতৃভাবময় সাধারণ-তন্ত্র। যে এই মহান্ উত্তরাধিকার বিসর্জ্জন করে, যে আপনাকে পৃথিবীর একমাত্র সন্তান জ্ঞানে নিজের ক্ষুদ্র শক্তি লইয়া সত্য-রাজ্যে প্রবেশ করিতে চায়, অভিমান-বশ হইয়া জাতও জনিয্যমাণের সহিত জ্ঞাতিত্ব অঙ্গীকার না করে, সে মূর্খ, সে অন্ধ। আমাদের জীবন গহনে মহাজন প্রোক্ত-বাণীই অনুসরণীয় পাদচিহ্ন স্বরূপ। সাধুজনের অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ আমাদিগের পরম সহায়। মানবের প্রধান রত্ন জ্ঞান, পুস্তক সেই জ্ঞানের ভাণ্ডার।

মহামতি বেকন বলিয়াছেন পুস্তকের জ্ঞানের উপর আর একটী জ্ঞান আছে যাহাতে জ্ঞানের ব্যবহার শিখায়। সাংসারিক লোকের পক্ষে এটি একটী অতি বিজ্ঞ কথা। কিন্তু টাকা পয়সার কথা ছাড়িয়া দিলে, আরও সূক্ষ্মতর রূপে দেখিলে, তাঁহার কথার আধ্যাত্মিক ক্ষুদ্রতা স্বতঃ প্রকাশ হইয়া পড়ে। প্রফেসর বেনের মত লোকেরা বলুন না কেন জ্ঞান অবান্তর উদ্দেশ্য ; উপায়, উদ্দেশ্য ভাব ধারণ করিয়াছে। জ্ঞান সমাজের বা নিজের সুখস্বচ্ছন্দের উপায় মাত্র। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানের সম্বন্ধে এ কথা সত্য কখনই হইতে পারে না। খৃষ্টধর্ম্ম প্রবর্ত্তক বলিয়াছেন সত্য জানিলে তোমরা স্বাধীনতা লাভ করিবে। শাক্য মুনি বলিয়াছেন জ্ঞানামুক্তি র্নসংশয়ঃ। মানুষ চক্ষুষ্মদন্ধ ; মোহে আবৃত হইয়া রহিয়াছে ; সত্যাসত্যের বিচার করিতে পারে না। জ্ঞান এই মোহ তিমিরের সূর্য্য ; জ্ঞানালোক উদিত হইলে তমোবিস্তৃতি স্বতই বিলোপ হয়। নেত্র অব্যাহত ভাবে অর্থ দর্শন করে ; অবিদ্যার শৃঙ্খল আপনা হইতে চ্যুত হয় ও আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা স্বয়ং উপস্থিত হয়। কেহ কেহ বলেন বহু জ্ঞানী পুরুষেরা মূর্খ ব্যক্তির ন্যায় কদাচার-পরায়ণ, অতএব জ্ঞান নিষ্ফল। কিন্তু যে জ্ঞান সৎকার্য্য প্রবর্ত্তক ও অসৎকার্য্য নিবর্ত্তক নহে, সে জ্ঞান জ্ঞান

পদবীর যোগ্য নহে। নলিনীদলগত তুষার বিন্দু এইরূপ ক্ষীণজ্ঞানের উপমাস্থল। কি সুন্দর বিন্দুটী! স্থূলমুক্তাটীর মত নাচিতেছে! একটী বাতাস আসিল অমনি বিন্দুটী মুক্তার মত খসিয়া পড়িল। যখন প্রলোভন নাই, তখন ক্ষীণমতি পুরুষের জ্ঞান উজ্জ্বল সুন্দর দেখায়। কিন্তু অতি ক্ষুদ্রতম কারণে উহা খসিয়া পড়ে। হৃদয়ের সহিত জ্ঞানের একত্ব যতক্ষণ না হইবে, প্রতি গ্রন্থিতে যতক্ষণ পর্য্যন্ত জ্ঞান দৃঢ়বদ্ধ না হয়, যতক্ষণ পর্য্যন্ত কমলদল ও নীহার বিন্দুর ন্যায় আমাতে ও আমার জ্ঞানের পার্থক্য থাকিবে, ততকাল জ্ঞানের রাজ্য অতি দুর্ব্বল, উহার স্থিতি সন্দেহস্থল। কিন্তু যে জ্ঞান বস্তুতঃ হৃদয়সম হয়, যে জ্ঞান জ্ঞানীর আত্মার অভেদ অংশ হইয়াছে সেই জ্ঞানই জ্ঞান। সুরাপায়ীর সুরাপানের নিন্দায় জ্ঞান তাহার জ্ঞান নহে; সে সেই জ্ঞানকে কোন পুস্তক হইতে, বা ব্যক্তি হইতে বা সমাজ হইতে ধার করিয়া লইয়াছে। সে ব্যক্তি জ্ঞানের নহে, জ্ঞানও তাহার নহে।

মানুষের আধ্যাত্মিক প্রকৃতি অতি বিচিত্র; ইহা তিনটী বস্তুর সমবায়; মনঃ, হৃদয় ও কার্য্য প্রবর্ত্তিনী ইচ্ছা। মনঃ জ্ঞানেন্দ্রিয়, হৃদয় ভক্তি প্রভৃতি ভাবের স্থান ও ইচ্ছা কার্য্য প্রবর্ত্তন। এই তিনটীর সমবায় না থাকিলে মানবের প্রকৃতি যন্ত্র বিশৃঙ্খল হইয়া গেল। সাম্যের ভঙ্গ হইল ও সাম্য সম্ভব উন্নতির সম্ভাবনাও তিরোহিত হইল। জ্ঞানবাদী জ্ঞানকে সিংহাসন দেন, ভক্তিবাদী ভক্তিরই প্রাধান্য প্রকটন করেন, কর্ম্মবাদী কর্ম্মই সর্ব্বোচ্চ বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। কিন্তু ফলতঃ তিনই এক, একেই তিন। প্রভেদ অভেদ তাহাদের প্রাকৃত ধর্ম্ম; মেল তাহাদের জীবন। প্রকৃত সাধুজনে কখনও তাহাদিগের দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয় না। তাহার সুন্দর হৃদয়ে তিনটী সুন্দর ভাই ভগিনী হাত ধরাধরি করিয়া সদাই নৃত্য করিতেছে। কি স্বর্গীয় নৃত্য, কি প্রেমালিঙ্গন, ঠিক যেন তিনটী সুন্দর পুতুলি এক কলকাটিতে নাচিতেছে—খেলিতেছে।

শ্রীজানকীনাথ ভট্টাচার্য্য।

অনাহুত।

তোদের মতন, অতিথি এমন
দেখিনি ত কভু জনমে।
কোন্ দেশে ছিলি, কোথাহতে এলি,
জুড়াতে তাপিত মরমে।
চুরী করে যাস্ কেড়ে নিয়ে যাস্
উলটী পালটী সব।
বকিবারে গিয়ে, ফেলি যে হাসিয়ে!
কি মধুর উপদ্রব!

বকিয়ে, বকিয়ে, দিলি মেরে ফেলে
একই কথা শত বার,
কোথায় শিথিলি, ভাঙা চোরা বুলি?
উত্তরে মেনেচি হার!
উঁকি ঝুঁকি চেয়ে, ছুটে যাও ভয়ে,
পুনঃ এসে, ধর গলে,
মিঠে মিঠে হেসে, কোলে চড়ে বসে,
প্রেম উৎস দাও খুলে॥

শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীযুক্ত বাবু পূর্ণচন্দ্র বসু প্রণীত।—

কাব্য-সুন্দরী—১৲
সমাজ-চিত্র—১৲

সংস্কৃত প্রেস ডিপসিটরী, ক্যানিং লাইব্রেরী, সোমপ্রকাশ ডিপজিটরী, বি, বার্ণার্জির পুস্তকালয়; মো, মো, মজুমদার কোং পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।—

কাব্যসুন্দরী সম্বন্ধে সম্বাদ-পত্রের অভিপ্রায়।

***** The language is simple and pleasant, and the author has herein displayed a happy nack of bringing his readers to a quick realization of the beauties and qualifications of the characters taken up for criticism.—Indian Mirror Sept. 20, 1880.

"বাঙ্গালা ভাষায় এরূপ গ্রন্থ এই প্রথম হইল। আলোচ্য গ্রন্থে পূর্ণবাবু বঙ্কিম বাবুর সৃষ্টি-চাতুর্য্য দেখাইয়াছেন।—সাধারণী ৭ই ভাদ্র, ১২৮৭।"

বাঙ্গালা সাহিত্যানুরাগী পাঠকগণ এই পুস্তকখানি পাঠ করিবার জন্য আমরা বিশেষ অনুরোধ করি। পূর্ণবাবু নিজে ভাবুক ও হৃদয়ালু। পাঠকের মনে সেই ভাবুকতা ও হৃদয়ালুতা সিঞ্চন করিয়া দিতেও বিলক্ষণ ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছেন। এই অভিনব গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া পূর্ণবাবু বঙ্কিম বাবুর সহিত একাসনে বসিতে অধিকারী হইয়াছেন। কাব্যসুন্দরী বাঙ্গালা সাহিত্যে নূতন সৃষ্টি। যাঁহারা বঙ্কিম বাবুর উপন্যাস-গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন, পূর্ণ বাবুর কাব্যসুন্দরী না পড়িলে, তাঁহাদের অধ্যয়ন-বিষয়ে অসম্পূর্ণতা থাকিয়া যাইবে।—"নববিভাকর ৭ই ভাদ্র, ১২৮৭।"